নবীজীবনের দ্যুতিময় কাহিনী গুচ্ছ

সবুজ গম্বুজের ছায়া

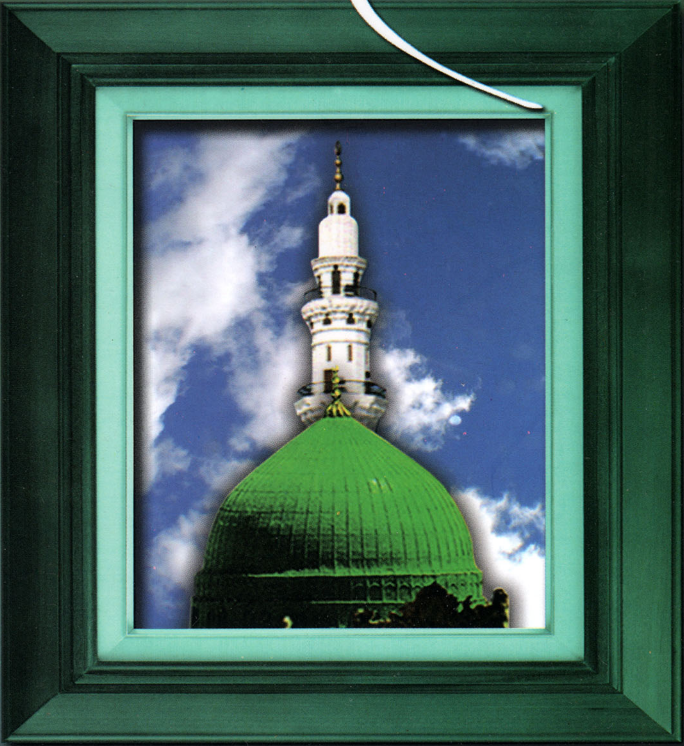

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ

নবীজীবনের দ্যুতিময় কাহিনীগুচ্ছ

সবুজ গম্বুজের ছায়া

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আল কাউসার

সাবেক উস্তায, জামিআ দারুল উলূম, মতিঝিল, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

ফররুখ আহ্‌মদ

আব্দুল আজীজ আল আমান

বাংলা কাব্য ও গদ্যের দুই আলোকোজ্জ্বল দিগন্ত।

মাগফিরাত ও রহ্‌মতের খাযানা আল্লাহ্ তাঁদের দান করুন।।

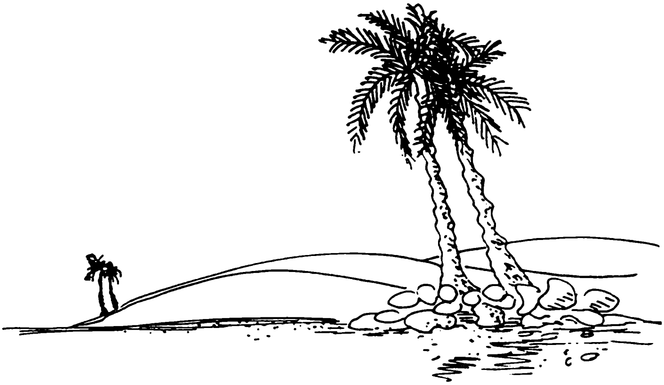

ন বী জী ব নে র দ্যু তি ম য় কা হি নী গু চ্ছ

সবুজ গম্বুজের ছায়া

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক, লেখক, চিন্তাবিদ,
প্রবীণ সাংবাদিক, দৈনিক ইনকিলাব-এর ফিচার
সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল গফুর লিখিত

ভূমিকা

গল্প শুনতে কে না ভালবাসে? নব্বুই বছরের বৃদ্ধ থেকে শুরু করে এক রত্তি শিশুও গল্পের ভক্ত। আর সে গল্প যদি হয় ইতিহাসের সত্য, বিশ্ব ইতিহাসের মহত্তম মানুষের জীবন থেকে নেয়া, তাহলে তো তার মূল্য আরও হাজার গুণ বেড়ে যেতে বাধ্য।

বাংলা-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অসংখ্য তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীগ্রন্থ বের হয়েছে। কিন্তু গল্পের আকারে আকর্ষণীয় করে তাঁর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। শিশুতোষ রচনার কথা বাদ দিলে বাংলা ভাষায় এ ধরনের রচনার পথিকৃৎ মরহুম আবদুল আজীজ আল-আমান। তাঁর পরই মহানবী (সা.)-র জীবনভিত্তিক এ ধরনের সার্থক প্রয়াস, বিশেষ করে এপার বাংলায়, সম্ভবত এই প্রথম। প্রথম হলেও একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, এ প্রয়াসে লেখক ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছেন।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে শরীফ মুহাম্মদ প্রায় অজানা একটি নাম। আমার সহকর্মী দৈনিক ইনকিলাব-এর সাহিত্য

সম্পাদক হাসনাইন ইমতিয়াজের মুখে তার প্রশংসা শুনেই প্রথম তার প্রতি আমি মনোযোগী হই। নবীজী (সা.)-র জীবনের ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে হাদীসের সত্য অতিক্রম না করে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা যে দুরূহ কাজ, তা সবাই কবুল করবেন। এই দুরূহ কাজটিই অভাবনীয় সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছেন শরীফ মুহাম্মদ। এ সাফল্যের মূলে রয়েছে তার আদর্শিক জীবন-চেতনা, গভীর নবীপ্রেম এবং উচ্চমানের সাহিত্য-প্রতিভা।

বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে আমি এই প্রতিশ্রুতিশীল নবীন সাহিত্যিককে খোশ আমদেদ জানাই। নবী-জীবনভিত্তিক সুন্দর এ গ্রন্থখানিকে হাশরের মাঠে আল্লাহ পাক লেখক ও তার সাথে সাথে আমাদের সকলের জন্য নবীজী (সা.)-র শাফায়াত লাভ ও নাজাতের ওসিলা করে দিন। আমীন।

গোনাহগার

আবদুল গফুর
১৭. ৫. ৯৯

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

কয়েক বছর আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বই মেলায় 'যমযম' নামের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সাময়িকী আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছিলো। বাসায় ফিরে স্বস্তির সাথে যখন পাতা উল্টাতে শুরু করলাম, তখন সম্পাদকীয় লেখাটির বৈশিষ্ট, নতুনত্ব, শিল্প-সাহিত্য ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপন আমার হৃদয়-জগতকে অন্য রকম এক আবিষ্কারের আনন্দে ভরে দিয়েছিলো। তখন আমি খুঁজতে থাকি 'শরীফ মুহাম্মদ' নামের সেই অচেনা সম্পাদককে। কয়েক দিন পর এ মেলায়ই এক ষ্টল মালিক একটি লোককে দেখিয়ে বলেন- ইনিই তিনি'। মুহূর্তেই ঘন চাপ দাড়িতে ঢাকা প্রায় এক যুগ পূর্বের এক কিশোরের শ্মশ্রুহীন বুদ্ধিদীপ্ত, দৃঢ়চেতা ও কৌতূহলী চেহারা আবিষ্কার করে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করি এবং মুবারকবাদ জানাই, কলমী জেহাদের জন্য। পরবর্তীতে তারই লেখা 'সাহাবায়ে কেরামের গল্প' নামের একটি চমৎকার বই সংগ্রহ করে পাঠ করি এবং সাহিত্য-অঙ্গণে লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠি।

কিন্তু অনেক দিন তার কোন বই না দেখে কিছুটা হলেও হতাশ হই এবং তাকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহ যোগাতে থাকি- ভাল বই পড়ার লোভে। এক সময় একথাও বলি যে, আপনার বই আপনার মনের মতো করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে। এ সব কথোপকথন ও যোগাযোগের ফসলই হলো 'সবুজ সম্বুজের ছায়া'-এর আত্মপ্রকাশ। এ নামটিই আমাকে চমৎকৃত করেছে।

পরে যখন এর বেশ কয়েকটি গল্প পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়, তখন মনে মনে লেখকের উপর চটে যাই। কারণ, আমার মনে হয়েছে এমন নতুন ধারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের কাহিনীগুলোকে জীবন্ত রূপে পাঠক সমাজকে উপহার দেওয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও লেখক এক্ষেত্রে অলসতা করে আমাদেরকে ঠকিয়েছেন। হাদীসের কিতাবে পড়া কাহিনীগুলো 'সবুজ গম্বুজের ছায়া'য় সত্যিই আমার কাছে জীবন্ত মনে হয়েছে।

আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এমন একটি সুন্দর বই 'মাকতাবাতুল আশরাফ' থেকে প্রকাশ করতে পেরে। সেই সাথে প্রকাশনার এই জটিল ময়দানে অভিজ্ঞতার দীনতা ও অপরিপক্কতাজনিত বিচ্যুতিগুলো উদার দৃষ্টিতে দেখার দরখাস্ত করে বিদায় নিচ্ছি।

তারিখ ঃ ৩রা রবিউল আউয়াল
১৪২০ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৩/৬ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা -১১০০

কৈফিয়ত

রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র জীবনই আলোকোজ্জ্বল একটি আকাশ, সমগ্র সীরাতই হিরা-মোতি-পান্নার একটি সমুদ্র। সেই আকাশ ও সমুদ্রসম প্রাচুর্যের ভাণ্ডার থেকে আহরিত দ্যুতির সামান্য বিকিরণই হলো– সবুজ গম্বুজের ছায়া। নিজের অযোগ্যতা, অসামর্থ ও ক্ষুদ্রতার স্তূপীকৃত জঞ্জালের উপর দাঁড়িয়েও সেই অপার্থিব আকাশ ও সমুদ্রের বিশালত্বের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছি। লোভে লোভে সাহসী হয়ে উঠেছি– এই মহান ও বর্ণাঢ্য জীবনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে যুগে যুগে যারা সৌভাগ্যবান হয়েছেন– তাদের তালিকার নীচে একটু ঠাঁই করে নিতে।

মূলত গোটা বিশ্বমানবতার উপর শ্রেষ্ঠতম এই মানুষের যে বিশাল ঋণ, তা শোধ করার কোন উপায় কারো জানা নেই। উল্টো এই ঋণের ভাণ্ডার আরো বাড়িয়েই সবাই সুখ ও সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন– তাঁর নামে দরূদ পড়ে, তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করে। সে হিসেবে উম্মতের এক অতি নগণ্য ও তুচ্ছতর সদস্যের সুবিনীত এই তোহ্ফাও সৌভাগ্য লাভেরই একটি অপরিণত প্রয়াস।

আবেগ ও সামর্থ উজাড় করে দিয়ে একটি-দুটি কাহিনী লিখেছি, পত্রিকায় দিয়েছি; ছাপা হয়েছে, আবারো লিখতে বসেছি। লেখালেখির এ পর্যায়ে সহায়তা গ্রহণ করেছি– বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ, নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ ইত্যাদি থেকে। আশায় আশায় পার হয়েছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। অবশেষে গ্রন্থবদ্ধ হয়ে পাঠকের হাতে এখন– সবুজ গম্বুজের ছায়া। বই প্রকাশের এই সুখকর মুহূর্তে নিজেকে দারুণ সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। সব তাওফীক, সব সৌভাগ্যের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তাই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অগণিত-অসংখ্য শুকরিয়া।

প্রাসঙ্গিক কারণেই উল্লেখ্য যে, উনিশশো আটাশি সনে কলকাতার মরহুম আব্দুল আজীজ আল আমান রচিত 'রৌদ্রময় ভূখণ্ড' পড়ে আমি সাংঘাতিকভাবে স্পন্দিত হই, আলোড়িত হই। এরপর বিভিন্ন সময়ে নবী জীবনের উজ্জ্বল কিছু ঘটনা ও কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখি। সেই লেখাগুলিরই সমন্বিত রূপ এই– সবুজ গম্বুজের ছায়া। গদ্যরীতি, উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার এবং কাব্যাশ্রয়ী গদ্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'রৌদ্রময় ভূখণ্ড' দ্বারা 'সবুজ গম্বুজের ছায়া' যথেষ্ট প্রভাবিত; এই সত্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে। এই সত্যের এবং এই ঋণের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি দিয়েই নিবেদন করছি– বইটিতে যে কোন পর্যায়ের মৌলিক ও বর্ণনাগত কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে বিজ্ঞ পাঠক সেটিকে একান্তই আমার ত্রুটি হিসেবে গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো এবং আমাকে অবহিত করলে পরবর্তীতে সেই ত্রুটি সংশোধন ও পরিমার্জনে অবশ্যই মনোযোগী হবো।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন দৈনিক ইনকিলাব-এর সাহিত্য সম্পাদক বন্ধুবর হাসনাইন ইমতিয়াজ। অপ্রত্যাশিত আন্তরিকতা ও দ্রুততার সাথে প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন আরেক বন্ধু মাওলানা হাবীবুর রহমান খান। এই দু'জনের প্রতি থাকলো কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। সশ্রদ্ধ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি বর্ষীয়ান সাহিত্যিক, অধ্যাপক আব্দুল গফুরকে, তাঁর হৃদয়জাত সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সবশেষে বইটির রচনা ও প্রকাশনায় নানা পর্যায়ে আরও যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং দুআর দরখাস্ত করছি সবার কাছে।

শরীফ মুহাম্মদ

১০/৬/৯৯

অন্য এক আগন্তুক

তাঁর মুবারক উপস্থিতিকে ঘিরে আছেন সবাই। ব্যাকুল মৌমাছির মতো, আজন্ম কৌতূহলীর মতো এবং প্রতি মুহূর্তের সজাগ সহচরের মতো তাঁরা রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে সমবেত। তাঁদের বিনম্র, প্রশান্ত ও শালীন সেই উপবেশনে অশেষ শ্রদ্ধা ও আকুলতা বাঙ্ময় হয়ে উঠছিলো বারবার। কোন জিজ্ঞাসা কিংবা প্রশ্ন নয়, জানতে চাওয়া-শুনতে চাওয়া আর উপলব্ধি অর্জনের একটি নিঃশব্দ আকুতি সবার চোখ-মুখ থেকে মোহনীয় দ্যুতির মতো ঠিকরে বেরুচ্ছিলো যেন। শ্রেষ্ঠতম মানবের চারপাশে সাহাবীগণের দলবদ্ধ এই জমায়েতে হাজির ছিলেন অনেকেই; অনেকের মাঝে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)ও, এ সময়েই অপরিচিত এক আগন্তুক এসে দাঁড়ালেন।

একদম উদয় হওয়ার মতো এই আগন্তুকের উপস্থিতি। এর আগে তাঁকে কেউ দেখেননি এই মজলিসের। আশ-পাশের তো নয়ই, এই তল্লাটের ধারে-কাছের কেউ তো এঁদের অপরিচিত নয়। ধবধবে সফেদ পোশাকের এই আগন্তুক তাহলে কোত্থেকে এলেন? দূরের কোন কবীলার কেউ কি? কিন্তু সফরের কোন চিহ্নও তো নেই তার গায়ে, পোশাকে, আচার-আচরণে। সবার চোখেই নীরব প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে উঠলো। অনুচ্চারিত সেই প্রশ্ন সবার চোখের তারা ও হৃদয়ের নিঃশব্দ ভাষায় ভেসে বেড়াতে লাগলো। ঠোঁট, জিহবা কিংবা মুখের কোথাও তার ঠাঁই মিললো না একবারও। এরই মধ্যে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হলো সে প্রশ্ন। ঘন কৃষ্ণ চুলে ভরা মাথা আগন্তুকের; তিনি অনতিদেরীতে এসে বসলেন নবীজীর মুখোমুখি, নবীজির হাঁটুর সাথে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে। সমবেত সাহাবীগণ তো স্তম্ভিত! একী! এ লোকের কি কোন শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ নেই!

হঠাৎ আগমন, সমবেত সহচরগণের পরিবেষ্টন ভাঙা এবং আসরের মহান মধ্যমনির মুখোমুখি বিনা আবেদন-আকুতির বিনিময়ে নিঃসংশয়ে বসে যাওয়া। এতো স্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। কে এই উজ্জ্বল সাদা পোশাকধারী? চাপা

ক্ষোভ, প্রতিবাদ কিংবা বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার এক ভাষাহীন ঝড় বয়ে গেলো অনেকের বুকের ভিতর। মীমাংসাহীন সেই ঝড়ের কবলে আক্রান্ত হয়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের আশ্চর্য শান্ত চেহারার আয়নায় অপ্রসন্নতার কোন আঁচড় পড়েনি। নিরুত্তাপ, অচঞ্চল, স্নিগ্ধ বিকালের মতো সেই মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসু, কৌতূহলী এবং অনাগত পরিস্থিতি দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। আগন্তুক হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে কোলে হাত রেখে বসার পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-র উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেনঃ

'হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম–কী?

ঝড় কিংবা তাণ্ডব নয়, মৃদু অথচ দৃঢ় এক ঝটকা বাতাসের মতো আগন্তুকের এই জিজ্ঞাসা পরিবেশকে চাঙ্গা করে ফেললো। মজলিস সম্পূর্ণ সজাগ ও সতর্ক হয়ে দেখলো, বিরক্তিহীন মুখের ভাঁজ ছড়িয়ে পড়ছে, বিকশিত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর। তাঁর ঠোঁট, মুখ আন্দোলিত হলো ধীরে ধীরেঃ

'ইসলাম হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল; নামায কায়েম করা, যাকাত দান করা, রমযানে রোযা পালন করা এবং পথ অতিক্রম সম্ভব হলে হজ্ব পালন করা।'

আল্লাহ্‌র প্রিয়তম মানুষ সবেমাত্র মুখ বন্ধ করেছেন। প্রশ্নের পিঠে জবাব, তাঁর কেবল শেষ হয়েছে। কালবিলম্ব ঘটার সুযোগ ও অবকাশ মিলার আগেই আগন্তুক বললেন, বিজ্ঞোচিত ভাষা আর ভাবে–

'আপনি ভুল বলেননি, যথার্থ আপনার বক্তব্য।'

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা এবং তাঁর উত্তর সত্যায়িত করা! একজন রহস্যমণ্ডিত আগন্তুকের এই আচরণ বিস্মিত করলো সমবেত উপস্থিতিকে, তাঁদের বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি করলো এবং তাঁরা আরো ভাষাহীন নীরবতায় ডুবে গেলেন। কারণ আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তো নির্বিকার প্রশান্তির সাথে তার প্রশ্ন শুনছেন। দুর্ঘটনা কিংবা কোন বিড়ম্বনার ছাপ তাঁর পরিচ্ছন্ন আদলকে একবারও কুঁচকে দেয়নি। বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলার আভাস নেই মুখোমুখি দু'জনের মাঝে। নিতান্ত স্বাভাবিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মতই সব ঘটছে। সাহাবীগণের ব্যাগ্রবিস্ময়ের মধ্যেই

আগন্তুকের আরো একটি প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র উদ্দেশে– 'এবার আমাকে বলুন, ঈমান– কী?'

প্রশ্নের মুখোমুখি আবারো রাসূলে আরাবী। ভোরের মমতা মাখানো মুখ তাঁর নড়ে-চড়ে উঠলো। সশব্দে আন্দোলিত হলো যবান– 'ঈমান হলো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, বিশ্বাস করা তাঁর ফেরেশ্তা মণ্ডলী, অবতারিত কিতাবসমূহ, প্রেরিত রাসূলগণ এবং বিচার দিনের উপর এবং আরো বিশ্বাস করা তাক্দীরের ভালো-মন্দের উপর।'

এবারও আগন্তুকের সত্যয়ন। আল্লাহ্র রাসূলের উত্তরের পিঠে পিঠেই তার উচ্চারণ– 'আপনি যথার্থ বলেছেন।'

মজলিস আর কতো অবাক হবে, বিস্ময় আর কতো তাঁদের তাড়া করবে! প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, সংশয় সবকিছুর ঊর্ধ্বে মজলিসের আদব। আল্লাহ্র হাবীব (সা.)-এর সশরীর উপস্থিতি এবং বিরতিহীন কথোপকথনের মাঝখানে কি কোন কথা চলে? সবাই তাই অসম্ভব নীরব। আগন্তুকের মুখ থেকে ততক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নটি ঝরে পড়েছে– 'তাহলে বলুন, ইহ্সান– কী?'

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন–

'আল্লাহ্র ইবাদত করবে এমনভাবে; যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি দেখতে না-ও পারো, অন্তত তিনি তোমাকে দেখছেন– এই একীন রাখবে।'

এরপর আগন্তুক তার চূড়ান্ত প্রশ্নটি করলেন এবং বললেন 'এবার বলুন, কিয়ামত হবে কবে?'

সবার নীরবতা আগের মতই। কিন্তু ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের প্রবলতা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে প্রায়। সজাগ অনুভবের সিনা টান টান হয়ে গেছে সকলের। সবাই উত্তরের জন্য অধীর। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

"জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক অবগত নয়।"

'তাহলে কিয়ামতের লক্ষণ ও আলামতগুলো কি হবে– বলুন?' এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন–

'দাসীরা তখন আপন মনিবদের জন্ম দিবে এবং নগ্নপদ, নগ্নদেহ দরিদ্র ছাগলপালক রাখালদের দেখবে আলীশান অট্টালিকায় আমোদ-প্রমোদ করছে।'

প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিসমাপ্ত হয়ে গেছে তাঁদের। আগন্তুক সকলের মাঝ থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং দায়িত্ব সমাপ্তির মতো অপার্থিব আয়েশী পদচারণায় বিদায় নিলেন মজলিস থেকে। মজমায় এতক্ষণের শ্রোতা, কৌতূহলী সাহাবীগণ তাঁকে চলে যেতে দেখলেন। দেখলেন তিনি হেঁটে চলে যাচ্ছেন এ অঞ্চল ছেড়ে। উপস্থিত সকলের মধ্য থেকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) অপসৃয়মান সেই আগন্তুকের চলন্ত ছায়ামূর্তির দিকে হয়তো তাকিয়ে ছিলেন দীর্ঘক্ষণ। বিস্ময়ের ঝড়ো বাতাস, রহস্যের এলোমেলো স্রোত এবং শৃঙ্গছোঁয়া কৌতূহলের ধাক্কা তাঁর গায়ে সম্ভবত লেগেছিলো একটু অধিক।

সমবেত সকলকে উপলব্ধি উপহার দেয়ার মতো করে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর প্রতি তাকিয়ে রাসূলে আকরাম (সা.) বললেন– 'উমর! জানো এই প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে?' রাসূলুল্লাহ্‌র এ প্রশ্নের উত্তরে উমর (রা.) বললেন সেই কথা, যা সাহাবীগণ বলেন, বলে থাকেন হর-হামেশা আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হলে, উত্তরটি জানা না থাকলে; কিংবা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু বলতে চাচ্ছেন আন্দাজ করতে পারলে মুআদ্দাব ও নিরাপদ যে উত্তরটি সাহাবীগণের ঠোঁট বেয়ে বেরিয়ে আসতো, সেই উত্তরই তিনি দিলেন– 'আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূল এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত।'

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এবার বললেন–

'ইনি জিবরাঈল (আঃ)। তোমাদের মাঝে এসেছিলেন, তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য।'

রহস্যের চাদর খুলে দিলে যেমন দর্শকের মুদ্রিত আঁখির বিস্ফোরণ ঘটে, চমকভাঙা আর ঘোরকাটার রেশ ছড়িয়ে পড়ে চোখে-মুখে নিমিষেই, সাহাবায়ে কেরামও তেমনি বিস্ময়ভাঙা বিস্ময়ের আরেক পাটাতনে গিয়ে আছড়ে পড়লেন।

এক পশলা স্মৃতির হাহাকার

মক্কার পথ। মায়ার অজস্র কণা-কণিকার মতো ধূলোবালি কী অদ্ভুত ভালো লাগা, কষ্ট পাওয়া স্মৃতির বাহন। সেইপথে, সেই ধূলোবালিতে সাত বছর পর কদম ফেললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের বছর। উমরা করলেন। এরপর আবার ফিরে চললেন মদীনার পথে, মক্কার নরম বালিতে ধীরে ধীরে পা ফেলে। সুখ-দুঃখ, বেড়ে উঠার স্মৃতি, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতিষ্ঠা মক্কায় এখনো না হওয়ার ভাবনা আর স্বভাবসুলভ প্রশান্ত ধ্যানমগ্নতার এক অপার্থিব আবীর মাথার উপর নিয়ে তিনি ফিরে চলেছেন।

তাঁর সঙ্গে আনসার-মুহাজিরদের অনেকেই; আলী (রা.), জা'ফর (রা.), যায়েদ (রা.)-ও আছেন। তাঁর খুব কাছাকাছি হেঁটে চলেছেন আলী (রা.)।

এ সময়েই, খুব দূর থেকে নয়, কাছাকাছি এক জায়গা থেকে শিশুকণ্ঠের একটি ডাক ভেসে এলো– 'চাচা-চাচা'। সবাই তাকালেন। একটি শিশু দৌড়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) কাছে এসে বাচ্চা মেয়েটি ব্যাকুল কণ্ঠে 'চাচা চাচা' বলে ডাকতে লাগলো। সবাই বাচ্চা মেয়েটিকে চিনতে পারলেন। এক ঝাঁক কষ্ট হঠাৎ করে গিয়ে যেন বিঁধলো আকাশে পরম নিশ্চিন্তে উড়তে থাকা শ্বেত কপোতের গায়ে– আর শ্বেত কপোতটি তড়পাতে তড়পাতে এসে আছড়ে পড়লো বিষণ্ন মরুর হৃদয়ে। সবাই শিশু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এই বাচ্চা মেয়েটির নাম উমামা। উহুদ যুদ্ধে নির্মম ভাবে শহীদ হওয়া সাহাবী, নবীজীর চাচা হযরত হামযা (রা.)-র এতীম কন্যা। মক্কায় নানা-বাড়ীতে থেকে গিয়েছিলো এই শিশু। উমরা করে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ রাসূলে আকরাম (সা.)-এর উপর দৃষ্টি পড়ে এই এতীম শহীদকন্যার। সম্পর্কে নবীজী তার চাচাতো ভাই। কিন্তু হামযা (রা.) ছিলেন নবীজীর দুধভাই এবং হামযার

সাথে নবীজীর সম্পর্ক ছিলো গভীর অন্তরঙ্গতার, অনেক কিছুর ঊর্ধ্বের। হামযার পরিবারে এ কারণেই দুধ ভাইয়ের সম্পর্কটিই মুখ্য হয়ে উঠেছিলো।

উমামা নবীজীর কাছে এসে দাঁড়ালো। তার ব্যাকুলতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এক পশলা হাহাকার হয়ে শূন্যে ছড়াতে লাগলো বেদনার পিচকারি। পবিত্র ভালোবাসার তশ্‌তরীতে যাঁর হৃদয়ের অবস্থান, তিনি বিলম্ব করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে স্নেহের নিবিড় ছায়ায় টেনে নিলেন। মমতার একটি পিণ্ড যেন রাসূলের বুকের উপর চড়ে বসলো। স্মৃতির এক জীবন্ত নদীর বুক চিড়ে ভেসে উঠলো কষ্টের চর। সেই চরে যেন স্থির, অনড় হয়ে গেলেন শ্রেষ্ঠতম মানুষ। আদর-সোহাগের সুশীতল পরশ উমামার শিশু মনে আনন্দের শিহরণ বইয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-র দুচোখ তখন ভারী হয়ে উঠেছে, উপচানো অশ্রুর তোড়ে।

আলী (রা.) পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং উমামাকে কোলে তুলে নিলেন। উমামাকে বরণ করে নেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিতে প্রস্তুত, উমামার প্রতি তাঁর সোহাগ ও স্নেহের ভাঁজে ভাঁজে এই ইচ্ছা ব্যক্ত হয়ে উঠছিলো অব্যক্তভাবে। এ সময়েই আলীর পাশে এসে দাঁড়ালেন জা'ফর (রা.); এলেন রাসূলুল্লাহ্‌র আযাদ করা গোলাম, রাসূলুল্লাহ্‌র পালকপুত্র যায়েদ (রা.)। তিনজনই উমামার দায়িত্ব নিতে চান এবং কেউ কাউকে এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নন। হামযা (রা.)-র স্মৃতির বেদনা আর স্নেহের এক কঠিন দড়িতে যেন তিনজনই বাঁধা পড়ে গেছেন, কেউ ছুটতে পারছেন না।

পাশে দাঁড়িয়ে সুখের দিগন্ত উন্মোচণ করার মতো এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। আহা হামযা! হামযার কন্যা! ভাবতে লাগলেন বীর হামযা (রা.)-র করুণ শাহাদাতের কথা তিনি। একদিকে তাঁর এতীম কন্যার দায়িত্ব নিয়ে হৃদয়বান তিন সাহাবীর কাড়াকাড়ির দৃশ্য। অন্যদিকে রক্তাক্ত, বুক চিড়ে ফেলা হামযার ক্ষতবিক্ষত দেহের স্মৃতি। বেদনার আর ভালোবাসার কী আশ্চর্য এক উপমা উপহার দিয়ে চলেছে স্মৃতি! মগজের কোষে কোষে নীল বেদনার স্মৃতি ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-র দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু কষ্ট, বিন্দু বিন্দু দরদ। তাঁর কপোল ভিজিয়ে ফেলেছে অশ্রুর ধারা।

আকাশে দল বেঁধে মেঘেরা মহড়া দেয়, গুড় গুড় শব্দের অনুরণন তুলে, বাতাসে ছড়ায় বৃষ্টির ঘ্রাণ। এরপর এক সময় তৃষিত যমীনের বুকে নেমে আসে বৃষ্টির কণা, ফোঁটা ফোঁটা মেঘ। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে সহানুভূতির সাইমুম, বেদনা ও মমতার সাইক্লোন ধেয়ে আসার জন্য প্রস্তুতিহীন আকস্মিক ঘটনাই যথেষ্ট হয়ে যেতে পারে। দৃশ্যপট তৈরীর কোন ধারাবাহিকতার প্রয়োজন হয় না।

তারপর সেই মানুষ যদি হন মানুষের প্রতি মমতাবান, স্নেহ ও ভালোবাসার অগণন ঝর্ণার প্রস্রবণ যদি তাঁর হৃদয়ে অহরহ অবিরত ঘটতেই থাকে, তখন কোন বেদনাতুর দৃশ্য তাঁকে কতটুকু অভিভূত, বিদ্ধ ও আর্দ্র করে তুলতে পারে, পৃথিবীর বহমান প্রহর তার হিসাব রাখে, রাখতেই হয় নিশ্চয়ই।

অশ্রুভেজা চোখ রাসূলুল্লাহ্‌র। তিনি তিনজনের দিকে আগেই তাকিয়ে ছিলেন; যারা উমামাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিলেন। এবার তিনজনকেই ডাকলেন। মীমাংসাহীন মমতার এই ভুবনভোলানো জটিল বন্ধন থেকে তিনজনের কাউকেই হয়তো মুক্ত করা যাবে না, করার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু উমামার ভবিষ্যত–জীবন কোন একজনের দায়িত্বে তুলে দেওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনেই তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

অশ্রুভেজা স্বরে তিনি ধীরে ধীরে মুখ খুললেন। আলী (রা.)-কে বললেন– 'আলী! তুমি আমা থেকে আর আমি তোমার থেকে।' উমামার দায়িত্ব বহনের দাবী থেকে সরে দাঁড়ালেন হযরত আলী (রা.)।

যায়েদ (রা.)-কে বললেন– 'যায়েদ! তুমি আমার ভাই এবং বন্ধু।'

হযরত যায়েদ (রা.) বুঝলেন, তাঁকেও সরে দাঁড়াতে হবে এই দাবী থেকে।

জা'ফর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'জাফর! তুমি অবয়ব ও চরিত্রে আমারই মত।'

দাবী থেকে হযরত জা'ফর (রা.)-কেও সরে দাঁড়াতে হলো।

এক-একটি ভুবনজয়ী বিশেষণ ও সুসংবাদ উচ্চারণ করলেন তিনি তিন সাহাবী সম্পর্কে। তাঁদেরকে কোন নির্দেশ নয়, প্রশান্তির এই বাস্তব বাক্যমালা

উপহার দিয়ে শান্ত করলেন। আর্দ্র বাতাসের ধাক্কা এবার লাগলো গিয়ে জা'ফরের স্ত্রীর গায়ে। তিনি আগেই অপেক্ষা করছিলেন। উমামাকে তাঁর হাতেই অর্পণ করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)।

আকাশের চাঁদ ধরে এনে হাতে তুলে দেবার মতই যেন তাঁর হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমামাকে তুলে দিলেন। খুশীতে ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে আন্দোলিত হলেন জা'ফরের স্ত্রী আসমা (রা.); তিনি উমামার খালা।

শহীদকন্যার যথার্থ ঠিকানা গড়ে তোলার মত আসমার হাতে উমামাকে তুলে দিয়ে রাসূলে আকরাম (সা.) ভালোবাসা, মমতা, স্নেহ ও স্মৃতি ধারণ করে ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে এক প্রাঞ্জল বাস্তবতার আকাশ থেকে ঘোষণা করলেন, জগৎবাসীর কানে কথাটি তুলে দিলেন– 'খালা মায়েরই সমান।'

মক্কার পথে আবারো কাফেলা সচল হলো; গন্তব্য মদীনা। ধূলোবালির গায়ে পায়ের নরম চাপ পড়তে লাগলো। হৃদয়ে ঝরতে লাগলো বেদনার কোমল পালক।

রূপান্তর ঃ বিপথ থেকে পথে

উমর ছুটে চললেন। খাপমুক্ত তলোয়ার হাতে সাইমুমের ক্ষিপ্রগতিতে তার এগিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করলেন নাঈম (রা.)। বুক কেঁপে উঠলো শংকায়, ভয়ে আর দুর্ভাবনায়। উমরের কাছাকাছি তিনি দাঁড়ালেন। উমরের তলোয়ারটি কার জন্য খাপমুক্ত হয়েছে আজ, জানতে হবে। উমরের এই তলোয়ার, তা নাহলে চূড়ান্ততম দুর্ঘটনাটি ঘটিয়ে বসতে পারে। দু'জনই মুখোমুখি হলেন। নাঈম জিজ্ঞাসা করলেন– 'কোথায় চলেছো উমর'?

সিদ্ধান্তের অবিচলতা উমরকে সামান্যতম সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদাসীন করে দিয়েছে। নিশ্চিন্তির এক প্রত্যয় থেকে তিনি উত্তর দিলেন– 'আমি ঐ বিধর্মী মুহাম্মদের (সা.) সন্ধানে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মাঝে বিভেদ

সৃষ্টি করেছে, তাদেরকে মূর্খ সাব্যস্ত করেছে, তাদের ধর্মের নিন্দা করেছে এবং দেব-দেবীকে গালি দিয়েছে। আমি তাকে হত্যা করবো।' উমরের ক্রুদ্ধ আদল আর স্পষ্ট জবাব থেকে নাঈম (রা.) বুঝে নিয়েছেন, তাঁর অনুমান নির্ভুল। এই ধ্বংসাত্মক ফয়সালা, লণ্ড-ভণ্ড করার এই একরোখা আয়োজন থেকে উমরকে এখন সরাতেই হবে, যে কোন পথেই সেটা সম্ভব হোক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার যে ফন্দী বেশ ক'দিন ধরেই কুরাইশরা আঁটছে, অবশেষে উমরই তা বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। উমরের নিজের দুর্ভাগ্য ঠেকানোর জন্য, মানুষ ও মানবতার কল্যাণের জন্য তাকে এখন দেখাতে হবে অন্য পথ। নাঈম বললেন– 'উমর! তুমি নিশ্চয়ই আত্ম-প্রবঞ্চিত হয়েছো। তুমি কি মনে করো যে, মুহাম্মদকে হত্যা করার পর বনু আবদে মানাফ তোমাকে ছেড়ে দেবে? তুমি অবাধে বিচরণ করতে পারবে? তুমি আগে বরং নিজের ঘর সামলাও।'

অবিচল, অনড় উমরের রাগী মাথায় হঠাৎ করেই প্রচণ্ড কৌতূহল দাপাদাপি শুরু করলো। রাগ, তাণ্ডব আর ধ্বংসের আয়োজনের সাথে এবার যোগ হয়েছে কৌতূহল। তার ঘরে আবার কার কি হতে পারে! তার পরিবারের মধ্যেই আবার কোন্ সমস্যা দেখা দিলো? সরাসরি নাঈমকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'কেন– আমার পরিবারের কে কি করেছে?' নাঈম এ জিজ্ঞাসার পর আর কোন বিলম্ব করলেন না। তৎক্ষণাৎ বললেন– 'তোমার ভগ্নিপতি ও চাচাতো ভাই সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা.) আর তোমার বোন ফাতিমা (রা.)-র খবর নাও। আল্লাহ্র কসম! ওরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। পারলে আগে তাদের সামলাও।'

চরম ঝুঁকিপূর্ণ সত্য একটি সংবাদ উমরকে উপহার দিলেন নাঈম (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-র প্রতি ধাবমান একটি প্রচণ্ড ঝড়ের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার যে কোন পন্থাই তাঁর কাছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তুলনামূলক ভালো বিবেচিত হয়েছে। একটি বিহ্বলতার চোরাবালিতে উমরকে নামিয়ে দিতে পেরেছেন তিনি। এখন তো এরই প্রয়োজন ছিলো, অন্য কোন বিবেচনা নয়।

মরুঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে যিনি ছুটছিলেন, এখন তিনি নিজেই যেন ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে গেলেন। পথহারা পথিকের হতবিহ্বলতা, বিমূঢ়তা তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। হঠাৎ শোনা কথাটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে তার।

নাঈম নিশ্চয়ই সত্য বলেছে। তার বোন-ভগ্নিপতিরই এই দশা! তাহলে অন্যকে আগে খুঁজে কি হবে! কিছুক্ষণ, অল্প কিছুক্ষণ ভাবনার কাঁদামাটিতে থমকে থেকেই উমর আবার সক্রিয় হলেন। রাগে-ক্রোধে ক্ষণিক আগের বিহ্বলতা সম্পূর্ণ উবে গেছে তার চেহারা থেকে। সে চেহারা এখন ক্রোধের রক্তিম আশ্রয়। টগবগ করছে খুন মগজের কোষে-কোষে। খাপমুক্ত তলোয়ারটা তখনও হাতে ধরা। আগে বোন-ভগ্নিপতিকেই ধরতে হবে, তারপর গোড়ায় হাত দিলেই চলবে। এবার ছুটলেন বোনের বাড়ির দিকে।

বোনের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে কান দুটো সজাগ করে নিলেন। শব্দ শুনলেন তাঁদের। কিন্তু শব্দগুলি তো পরিচিত নয়, অপরিচিত কোন বাক্যমালা ওরা আবৃত্তি করছে। দাউ দাউ উত্তেজনার আগুনে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন উমর। তাহলে কি ধর্মান্তরিত ওরা হয়েই গেছে? মেধা, চিন্তা আর মস্তিষ্ক– ভাবনার সকল উপাদান হঠাৎ যেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বুকের ভিতরে উন্মাদ একটি ঘোড়া শুধু হ্রেষারব করে যাচ্ছে। আর এক মুহূর্তের বিলম্ব সহ্য করতে পারলেন না, সোজা উঠে এলেন ঘরে। রাগী উমরের ধিকি ধিকি জ্বলা দু'চোখ স্থির হয়ে রইলো বোন-ভগ্নিপতির চেহারার উপর। ভীত-সন্ত্রস্ত সে চেহারা দু'টি উমরের বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা অগ্নিকুণ্ডকে সামান্যও শীতল করতে পারলো না। দু'কি চারটা প্রশ্নোত্তর, তারপরই মার শুরু করলেন উমর। কোন দিকেই তার নজর নেই। মারতে শুরু করেছেন আগে ভগ্নিপতিকে, এরপর বোনকেও। মারছেন এবং মারছেন, শুধুই মারছেন। মারের ভাগেভাগে, আঘাতের ভাঁজেভাঁজে ক্রোধ সব টুকরো হয়ে ঝরে পড়ছিলো। মারের মাঝামাঝি সময়ই আহত দু'জন উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিবাদ ও সাহসের পাটাতনে দুটি বিশ্বাস বিপ্লবী ও প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশী করতে পারেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা.)-র হত্যাকাণ্ড যার লক্ষ্য, তিনি শুনলেন রাসূলের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি। তার তো আরো ক্ষিপ্র ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠার কথা। আরো রাগ ও তাণ্ডবের স্বাক্ষর রচনা করতে থাকার কথা। কিন্তু উমর আর রাগতে পারলেন না। বোনের শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখে তিনি নিথর হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে। উমর একটু দুর্বল হয়ে গেলেন কি? রক্তপাতের মতো

ঘটনা যার হাতে দিনে-রাতে, হর-হামেশা অহরহই ঘটতে থাকে, ঘটতে পারে, বোনের রক্তে চোখ পড়তেই সে পুরুষ থমকে গেলেন। বেদনাময় রক্তপাতের সুরেলা ইতিবৃত্ত এখানে এসে শ্লোগান হয়ে উঠলো। সে শ্লোগানের মুখোমুখি হয়ে উমর আর সামনে বাড়তে পারলেন না। হঠাৎ করেই রূপান্তরের উল্লাস তার বুকে ঢোল পিটাতে লাগলো। হৃদয়ে শুরু হলো বিগলন, আত্মার পাশাপাশি জেগে উঠলো উপলব্ধির এক শোভিত পলাশ। খুবই নরম সুরে তিনি বললেন– 'যা পড়ছিলি তোরা, আমাকেও একটু শুনতে দিবি?'

আহত বোন সংশয় আর আশার মাঝামাঝি দুলছেন। কুরআনের অমর্যাদা করতে পারে ভাই কিংবা কুরআন থেকে পেতে পারে হিদায়াত, এই শংকা ও সম্ভাবনায় দোল খেতে খেতে তিনি সামান্য দ্বিধা প্রকাশ করলেন। উমর আশ্বাস দিলেন, কুরআনের অমর্যাদা তিনি করবেন না। অবশেষে বোনের আব্দার যেন ঘোষণার মত শোনালো– 'তুমি তো শিরকের কারণে নাপাক হয়ে আছো! তুমি পবিত্র হয়ে এসো।'

হঠাৎ করেই উমরের কি হলো কে জানে। বুকে তখন চেতনার আলোর বিন্দুরা ডুবসাতার খেলছে। সত্যের প্রজাপতিরা ভাবনার দিগন্তে দিগন্তে ডানা মেলে উড়তে চাইছে। তিনি গোসল করে এলেন কথা মতো। বোনের কাছাকাছি বসলেন ধীরে ধীরে। ভেজা শরীরের আমেজ এখনো পুরোপুরি কেটে যায়নি। কুরআনের একটি-দুটি আয়াত পড়লেন-শুনলেন। তার আচরণ, নড়া-চড়ায় তখন বিপুল সমীহ, সম্ভ্রম ঝরে ঝরে পড়ছিল। প্রচণ্ড এক আঘাতে বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে আগত পানির অনিয়ন্ত্রিত তোড়ের মতো হৃদয়ে এসে জমা হতে শুরু করেছে শাশ্বত বিশ্বাসের রাশি রাশি প্রাচুর্য, অঢেল বৈভব, অগণিত আলোর ফোয়ারা। তিনি স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন– 'কী সুন্দর! কী মহান।'

উমরের এই অভাবিত উপলব্ধি, এই অভূতপূর্ব অর্জনে, আনন্দ আর উল্লাসে ফাতিমা-সাঈদের সংসার-দাম্পত্যে অজস্র, অগণিত উৎসব যেন একসঙ্গে আছড়ে পড়লো; স্তূপ স্তূপ খুশীর ডালি যেন একসঙ্গে উপুড় হয়ে পড়লো। এতক্ষণ পর্যন্ত আড়ালে লুকিয়েছিলেন যে খাব্বাব (রা.), ফাতিমা (রা.) ও সাঈদ (রা.)-এর

কুরআন শিক্ষাদাতা, তিনি এসে বললেন– 'উমর! তুমি আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দাও।'

ব্যাকুল এক তৃষ্ণার্ত মানবাত্মা হাহাকার করে উঠলো। সত্যের জন্য, ইসলামের জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন 'আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর সন্ধান দাও খাব্বাব! আমি তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবো।'

খাব্বাবের কথামতো উমর ছুটে চললেন আবার। কাঁধে ঝুলানো এখনো তলোয়ার! কিন্তু এ উমর তো সেই উমর নন। এ তো রূপান্তরিত এক সাহসী মানব, যার চেতনার দরজাগুলি একটু আগে খটাস খটাস করে খুলে গেছে, বিশ্বাসের শান্ত পায়রাগুলি আকাশে নিরাপদ ডানা মেলেছে, অমানুষের দীর্ঘ ফিরিস্তি থেকে যিনি এইমাত্র উঠে এসেছেন মানুষের তালিকায়, ফেরেশতাসুলভ শালীন মানবতায়। তিনি এসে নির্ধারিত দরজায় করাঘাত করলেন। সতর্ক সাহাবীগণ তাকে পরখ করলেন ভিতর থেকে। শংকিত হলেন, আশান্বিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন– 'তাকে ভিতরে আসতে দাও।'

উমর এসে মুখোমুখি হলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের। অন্যভাবে অন্য প্রস্তুতিতে, অন্য চিন্তায়। পৃথিবীর সবচেয়ে মমতাবান মানুষটি উমরের আস্তিন চেপে ধরলেন, জিজ্ঞাসা করলেন– 'কেন এসেছো উমর?'

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূল ও নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনার জন্য এসেছি।' উমর বিলম্ব না করে উত্তর দিলেন।

উমরের কথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হলেন বিস্ময়ে, উৎফুল্ল হলেন অসীম আনন্দে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন– 'আল্লাহু আকবর'।

সত্য ও সাহস যেন আজ এক সঙ্গে মুলাকাত করলো। ইসলামকে আলিঙ্গন করলেন হযরত উমর (রা.)। বিপথ থেকে পথে এসে উঠলেন হযরত উমর (রা.)। চেতনায় ছুটলো নূরের ঝর্ণাধারা।

নিবেদন! আত্মনিবেদন!!

কাফেলার গতি উপত্যকায় এসে থেমে পড়লো। থেমে পড়লেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর কয়েকশ' সঙ্গী-সহচর; সাহাবী। একটি বৈরী আয়োজনের গন্ধে কাফেলার গতি এখানে, এই 'যাফিরান' উপত্যকায় এসে বন্ধ হয়ে গেছে। পথ থেকে পথে মরুর রাগী বালির উত্তাপ মাড়াতে মাড়াতে ক্লান্তির কোলে নিজেদের ঢেলে দেবার যখন সময় এসেছিলো, বিরাম ও বিশ্রামের ভিতরে বাতাস সবাইকে পরশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখনই খবর এসেছে জিঘাংসার, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের। কুরাইশের গোত্রপতি ও নেতাদের নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক সশস্ত্র লোক এই পথে এগিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র শান্তির অভিযান তারা এবার সম্পূর্ণভাবেই একটি রক্তাক্ত পরিণতির মাধ্যমে পণ্ড করতে চায়। অপবিশ্বাস, অবিশ্বাস ও অপসংস্কৃতির প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে মানুষ ও মানবতাকে বাঁচানোর তাগিদে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর হাতে হাত রাখা কয়েকশত মানুষের কাফেলা এখন এই সংকট মুকাবিলার গতি-পথ নির্ধারণ করবেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন সত্যের ভবিষ্যত ইঙ্গিত করবে; সেজন্যেই কাফেলার অবতরণ এই উপত্যকায়।

পাহাড়ী মরুর বাতাস যেন বড় বেশী রুক্ষ আর ঝড়ো হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ এবং রক্তপাতের ইতিহাস বয়ে বয়ে যে মরুভূমি ক্লান্ত হতে চলেছিলো, আশু একটি অন্য রকম যুদ্ধের আভাস যেন তার তেজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। গোত্রস্বার্থ, অর্থ, প্রতিপত্তি আর জিঘাংসার জন্যই যেখানে রক্ত ঝরেছে যুগ যুগ, সেখানে এবার সত্য-মিথ্যার, শান্তি-অশান্তির, হক-বাতিলের একটি মীমাংসা-লড়াইয়ের সাজ সাজ ভাব মরুর পরিবেশকে করে তুলেছে উৎসুক; আনন্দিত আর শংকিত।

যাফিরান উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (সা.) পরামর্শের ডাক দিলেন। মজমা বসলো একদল মানুষের, একগুচ্ছ উৎসর্গিত হৃদয় ও ভালোবাসার। বসলেন মুহাজির এবং মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা আনসার সাহাবীগণের শীর্ষস্থানীয় প্রায়

সকলেই। সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন একটি মিশনে, ছোটখাটো অথচ প্রয়োজনীয় একটি অভিযানে। প্রস্তুতি সামান্য কিন্তু এখন সকলেই অস্ত্রসজ্জিত একটি রণবহরের মুখোমুখি। বিশ্বাস এবং উৎসর্গের চেতনা যে এই বাস্তবতার মুখোমুখি দুর্বিনীত হয়ে দাঁড়াবার, একথাও সবাই জানেন। তারপরও পরামর্শ। কারণ সিদ্ধান্ত দেবেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপস্থিত মজমার কাছে জানতে চাইলেন, প্রথমবার– 'কি করা উচিৎ এখন'? দৃশ্যত এটি একটি জিজ্ঞাসা হলেও এর মাঝে যেন ছিলো এক সাগর আবেদন, এক আকাশ প্রত্যাশা। সাহাবীগণের মাঝে যাঁরা সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয়– আবু বকর (রা.), উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) সহ সেই মুহাজির সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বললেন। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাউকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দ্বিতীয়বার জানতে চাইলেন– 'কি করা উচিত?' আবারো আবেদনমাখা জিজ্ঞাসা। এবারও মুহাজির সাহাবীগণ জিহাদের জন্য প্রস্তুতির পরামর্শ দিলেন। অভিন্ন প্রশ্নই তৃতীয়বার বের হলো অদ্ভুত প্রশান্ত সেই মুখ থেকে। এবার মজমা সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠলো। একই প্রশ্ন দু'বার করার পর, এর সম্পূর্ণ কাঙ্খিত জবাব, প্রত্যাশিত মনোভাব শীর্ষ সাহাবীগণ ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্র রাসূল তারপরও তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করলেন। নিশ্চয়ই তিনি আরো কিছু শুনতে চান, আরো কারুর মনোপ্রস্তুতি তিনি জানতে চান।

হিজরতের দ্বিতীয় বছরে মদীনার পার্শ্ববর্তী এই গিরিউপত্যকায় একটি প্রতিরোধ রণ-প্রস্তুতির জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ যাঁদের ভূমিকা, সেই মদীনাবাসী আনসার সাহাবীগণের প্রতিনিধিত্বশীল দু-একজন ইতোমধ্যেই আন্দাজ করে ফেলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-র জিজ্ঞাসার জবাবে মদীনার আনসারদের পক্ষ থেকে কেউ বিশেষভাবে কিছু বলেননি। না বলার কারণটি হলো, কিছু বলার তাঁরা প্রয়োজনই মনে করেননি। পরামর্শ ও রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সিদ্ধান্তই যে তাঁদের সিদ্ধান্ত, তাঁরা এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই ধরে রেখেছেন। তাঁদের নীরবতার অন্য কোন অর্থ হয়েও যেতে পারে, এটা তাঁরা ভাবেনও নি। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সা.) তাঁর অতন্দ্র স্মৃতি, প্রখর সচেতনতার কারণে মদীনাবাসী আনসারদের পক্ষ থেকে হিজরতের পূর্বকালে তাঁকে দেয়া

অঙ্গীকারের কথা সম্পূর্ণ মনে রেখেছেন। সেদিন আনসারগণ অঙ্গীকার করেছিলেন– 'মদীনার নগরসীমার ভিতরে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের, মদীনার ভিতরে আপনার শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের দায়িত্বও আমরা বহন করবো।' কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট অন্য রকম। মদীনার বাইরেই আজ যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্র মদীনার নগরসীমার ভিতরে নয়। এতে কি আনসারগণ কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করবেন? তাঁদের কৃত অঙ্গীকারের কথা, তাঁদের দায়-দায়িত্বের সীমানার কথা ভেবে কি এখানকার সিংহভাগ আনসার সাহাবী সরে যাবেন? এই ভাবনাটি আল্লা্‌র রাসূলের চিন্তায় ইতস্তত নড়াচড়া করছিলো। একবার, দু'বার এবং একই প্রশ্ন তিনবার মজমার প্রতি ছুঁড়ে দেবার এটিই হলো রহস্য।

তৃতীয়বার প্রশ্নটি শুনে আনসার-মদীনাবাসী সাহাবীগণের অনেকেরই উপলব্ধির ফটক উন্মোচিত হলো। ইতিপূর্বে দুবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা নীরবতা পালন করার কারণে যে অর্থবোধক একটি গুমোট হাওয়া এই মজমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো, তৃতীয়বার প্রশ্নটি উচ্চারিত হওয়ার সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই গুমোট হাওয়া পরিণত হলো অনাবিল, হৃদয় দোলানো ফুরফুরে বাতাসে। কারণ ততক্ষণে বিশিষ্ট আনসার সাহাবী সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন মজমার সমবেত উপবেশন থেকে। কিন্তু তিনি যেন উঠে দাঁড়িয়েছেন প্রত্যয় ও বিশ্বাস, অঙ্গীকার ও উৎসর্গের এক আকাশস্পর্শী পর্বত-চূড়ায়। তিনি সেই চূড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার বারবার জিজ্ঞাসার কারণ হয়তো আমাদের অভিমত সম্পর্কে জানতে চাওয়া। আনসারদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে নিবেদন করছি, আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছা করেন, আমাদের সম্পর্কসূত্র কেটে দিন, যার সঙ্গে ইচ্ছা করেন, জুড়ে দিন। আপনি আমাদের সম্পদ থেকে যতটুকু ইচ্ছা হয় নিয়ে নিন, যতটুকু ইচ্ছা হয় আমাদের মাঝে রেখে যান। আমাদের সম্পদের যেই অংশ আপনি গ্রহণ করে নিবেন, তা আমাদের সম্পদের ঐ অংশ থেকে উত্তম, যে অংশ আমাদের মাঝে রেখে যাবেন।

আত্মোৎসর্গের অপার্থিব ঝর্ণা ধারায় স্নাত হতে হতে তিনি আরো বললেন–

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেই হুকুম-ই করবেন, আমরা তার অনুগামী থাকবো। আপনি যেখানেই যাবেন, আমরা আপনার সঙ্গে থাকবো। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি হুকুম করলে পার্শ্ববর্তী সাগরে আমরা আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আপনি যুদ্ধে অবতরণ করুন। আমরা কেউ আপনাকে ছেড়ে যাবো না।'

সা'দ ইবনে মুআযের এই আবেগপূর্ণ আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতি মজমায় ফুরফুরে প্রশান্তির বাতাস প্রবাহিত করলো। তখন আনসার সাহাবীগণের আরেকজন, মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) সেই ফুরফুরে বাতাসকে আরো বেগবান করে বললেন- 'আমরা সেই বনি ইসরাঈল নই, যারা তাদের নবী মুসা (আ.)-কে বলেছিলো- 'যান! আপনি এবং আপনার প্রভু গিয়ে লড়াই করুন'। আমরা এখানে বসে আছি। আমরা আপনার দাস। আপনার ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

ইসলাম যেন আজ মধ্য দুপুরে সাহারার বুকে শীতল ঝর্ণাধারা। বুক উজাড় করা প্রেম আর ভালোবাসা আজ অনেক বেশী উৎসর্গিত, চেতনায় দীপিত আর গভীর। নির্বাসিত মনুষ্যত্ব ও সংহতি আবার খুঁজে পেয়েছে ইতিহাস। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে, ভয় ও প্রত্যাশার মাঝে, জয় ও পরাজয়ের মাঝে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে বিশ্বাস। বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে প্রত্যয়।

সাহাবীগণের সকলের, মুহাজির ও আনসারগণের আত্মোৎসর্গের এই স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোগান রাসূলে আকরাম (সা.)-এর প্রশান্ত অবয়বে বিস্তৃত করলো হৃদয়োৎসারিত আনন্দের রেখা। তিনি খুশী হয়েছেন। এরপর হুকুম করেছেন এক গুচ্ছ উৎসর্গিত হৃদয়কে, একদল সত্যসৈনিককে জিহাদের পথে এগিয়ে যাবার জন্য।

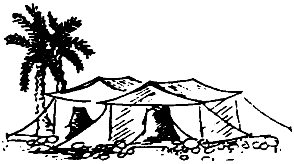

বিন্দু বিন্দু রহমত

তাঁর কাছে খরব এলো, এখনই রওয়ানা দেবার জন্য। সন্তানের ব্যাকুল আব্দার তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে বেদনার মূর্ছনা তুললো, কম্পন তুললো স্নেহের বিশাল সমুদ্রে। কিন্তু তিনি উঠলেন না, উঠতে পারলেন না। দ্বীন ও কল্যাণের অপার্থিব ব্যস্ততা তখন তাঁকে নিমগ্ন করে রেখেছে, অলৌকিক এক দায়িত্বের পাঠশালায় তাঁকে ঘিরে রেখেছে সাহাবীগণের মুবারক জমায়েত। সবার মাঝখান থেকে না উঠে, না সরে অচঞ্চল এক স্থির ও প্রশান্ত চেহারা নিয়ে তিনি সংবাদদাতার সংবাদ শুনলেন।

যয়নব (রা.)– রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদরের কন্যা– সংবাদ পাঠিয়েছেন। তাঁকে এক্ষুণি যয়নবের ঘরে তশরীফ নিয়ে যাবার এক আকুল আবেদন নিয়ে এসেছে সংবাদদাতা। যয়নব (রা.)-র এক অসুস্থ মেয়ে তখন কঠিন মুহূর্তে পৌঁছে গেছে। যয়নব সন্তানের এই মৃত্যুযাত্রায় বেচাইন ও বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বিষণ্ন আর অস্থির হয়ে তাঁর মহান পিতার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন। কঠিন, কঠোর ও বেদনাবহ মুহূর্তে তিনি মানবতার ত্রাণকর্তার সাক্ষাত চাইছেন, সান্ত্বনা চাইছেন, পরামর্শ ও সান্নিধ্যের এক মখমল নরম পরশ চাইছেন। যয়নব সংবাদ পাঠালেন বুকভাঙা ব্যাকুলতায়, স্নেহ ও মমতার এক আকাশ অনুভূতির দাবী ধ্বনিত করে– 'আমার মেয়ে মৃত্যু-পথযাত্রী। আব্বা! আপনি আমাদের মাঝে আসুন।'

ভোরের আকাশের মতন স্নিগ্ধ সেই পবিত্র মুখ সমুদ্রের অথৈ জলরাশির মতো বিপুল স্নেহ ও আশ্বাস ধারণ করে সংবাদদাতাকে সালাম জানিয়ে পুনরায় যয়নবের কাছে পাঠালেন। কন্যাকে সালাম দিয়ে বেদনাভারাক্রান্ত সকল মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি ও সান্ত্বনার প্লাবন বইয়ে দেবার মত এক অলৌকিক বাণী পাঠালেন– সবকিছুই আল্লাহ্‌র জন্য, যা তিনি নিয়ে যান এবং যা দান করেন। প্রত্যেক মানুষই এক নির্ধারিত মেয়াদ পূরণ করে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। যয়নব যেন ধৈর্য ধারণ করে, যয়নব যেন এই সংকটকে পুণ্য বিবেচনা করে।

কিছুক্ষণ পর আবার সংবাদ এলো। রাসূলে আকরাম (সা.)-কে নিজের ঘরে তাশরীফ নিয়ে যাবার জন্য কসম করে, আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন যয়নব–রাসূলে আকরাম (সা.)-এর মমতাময়ী কন্যা। একবার সান্ত্বনার বাণী আর মমতাভরাট নিশ্চিন্তির বাক্য বলে পাঠানোর পর আবারো সংবাদ। পিতার প্রতি, মানুষ ও মানবতার মহান শিক্ষকের প্রতি আরো জোরালো, আরো আব্দারমাখা, আরো ব্যাকুলতাঝরা আবেদন এসেছে কন্যারপক্ষ থেকে, মহান শিক্ষকের এক ছাত্রীর পক্ষ থেকে।

রাসূলে আকরাম (সা.) এবার বসে থাকতে পারলেন না। উঠলেন, সমবেত আসরেও নাড়াচাড়া পড়লো। উঠে পড়লেন তাঁর সঙ্গে সা'দ ইবনে উবাদা (রা.), মু'আয ইবনে জাবাল (রা.), উবাই ইবনে কা'ব (রা.), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) এবং আরো অনেকে। আল্লাহ্ রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের একটি মুবারক দল যয়নবের বাড়িতে এসে হাজির

হলেন। অনতিবিলম্বে অসুস্থ কন্যাকে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সামনে তুলে ধরা হলো। তিনি দেখলেন, অসুস্থ শিশুর নাড়িতে স্পন্দন হচ্ছে, শ্বাস-প্রশ্বাস উঠা-নামা করছে দ্রুত। অসুস্থতার তীব্রতায় শিশুটি পীড়া অনুভব করছে। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে, চুলোয় চড়ানো হাড়ির শব্দের মতো। তখন এক মানবশিশুর প্রতি, এক সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, মমতা আর কোমল অনুভূতিতে তাঁর বুক ভিজে উঠলো। শেষ পর্যন্ত অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়লো তাঁর দু'চোখ বেয়ে। বিন্দু বিন্দু অশ্রু ভিজিয়ে তুললো তাঁর দুচোখ, চোখের কোল।

অবিচল, দৃঢ় ও প্রচণ্ড আস্থাশীল সেই মানুষকে নিঃশব্দে অশ্রু ঝরাতে দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ হতবাক, বিস্মিত ও ব্যাকুল হয়ে গেলেন। তিনিতো মৃত্যু-পথযাত্রী যে কারুর সামনে, যে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে সব সময় বারণ করে এসেছেন। উপস্থিত সাহাবীগণের এই ব্যাকুলতাকে ভাষা দিয়ে সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) বলে ফেললেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একী?'

প্রকৃতির যে কোন দৃঢ়তার চেয়েও যিনি দৃঢ়, প্রকৃতির যে কোন বিগলনের চেয়েও যিনি বিগলিত; দায়িত্বের প্রশ্নে সর্বোচ্চ কঠোরতা আর ভালোবাসা ও মমতার প্রশ্নে সবচেয়ে বিশাল মমতার সাগর যিনি তাঁর হৃদয়ে লালন করেন, সেই রাসূলে আকরাম (সা.) যেন বলতে চাইলেন, এ নিঃশব্দ অশ্রুপাত তো সেই নিষিদ্ধ বিলাপ নয়, এতে তো দূষনীয় কিছু নেই। কিন্তু তিনি শুধু বললেন– বৃষ্টির শেষে ভেসে উঠা নরম সূর্যালোকের মতো স্নিগ্ধতা ও কোমলতার পরশ কণ্ঠে মেখে– 'এ হচ্ছে রহমত, এ হচ্ছে দয়া। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে এই দয়া পুঞ্জীভূত রেখেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সেই সব বান্দার প্রতি-ই দয়া বর্ষণ করেন, যারা দয়াশীল।"

শান্তির জোয়ারে

হঠাৎ ঝড়ের আশংকায় থমকে যাওয়া উটের মতো আবু সুফিয়ানের পা দুটো আটকে গেলো মরুর বালিতে। আর তো এগুনো যায় না। বুকটায় কৌতূহল ও ভীতির স্রোত শুরু হয়েছে অল্প আগে। সে স্রোতে এখন অতল সাগরের সাহসী তরঙ্গ। কিভাবে এত লোক চলে এলো এখানে? এত বড় দল? এরা কারা আলোর

মেলা বসিয়েছে অন্ধকারে? বারবার আগুনে পুড়ে পুড়ে তাতিয়ে উঠা লোহার মতই তার গনগনে মগজে ভাবনার মাতাল দৌড়া-দৌড়ি শুরু হয়ে যায়। ঠায় দাঁড়িয়েই পর্যবেক্ষণ টাওয়ারের মত ঘুরে ঘুরে দেখেন সারাটা এলাকা। পাহাড়ের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত এক ভূখণ্ডে শুধু তাঁবু আর তাঁবু। মরুর আকাশে মিটি মিটি জ্বলা অজস্র তারার মতই জ্বলছে অজস্র প্রদীপ সবক'টি তাঁবুর পাশে। হাজার হাজার মুসাফিরের নীরব অবস্থান, নীরব সংলাপ, ইতিউতি আনাগোনা আর নীরব শপথের বাতাস এসে লাগে তার গায়ে। অদ্ভুত শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠে তার গর্বিত অস্তিত্ব। মক্কার বয়সে কখনো এতো শানদার রাত নামেনি! এতরঙ ধরেনি মরুর রাতে আর! তবু কুরাইশ নেতার বেচাইনির অন্ত নেই।

আর তো সামনে বাড়া যাচ্ছে না। কিন্তু খোঁজ যে নিতেই হবে, ওরা কারা? কিভাবে এলো এইখানে? পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা ভয়েরা হঠাৎ করেই যেন জোর পায়। সামান্য কাঁপুনি দিয়ে যায় তার পাকানো দেহে। হৃদয়ের কোণে কোণে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জোর লড়াই। বিচ্ছিন্ন ঘোড়ার পালের মতো এদিক-ওদিকের অসংখ্য চিন্তা-ভাবনাকে মুঠো করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আবু সুফিয়ান। পাশে দু'জন সঙ্গী নিয়েও আবু সুফিয়ান কি করবেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। স্বগতোক্তির মতো বললেন– 'এতো আগুনের শিখা তো আমি আর জীবনে দেখিনি।' চূড়ান্ত শংকার বরফ ঝরে ঝরে পড়ছে তার কণ্ঠ বেয়ে। তার কথাটা লুফে নিয়ে পাশের একজন বললো– 'মনে হচ্ছে বনু খুযা'আ গোত্রের লোক এরা।' আবু সুফিয়ানের পোড় খাওয়া চোখ আর অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষণী চিন্তার কাছে উক্তিটি গুরুত্বহীন হয়ে ধরা দিলো। আবু সুফিয়ান আবার বললেন– 'আরে বনু খুযা'আ তো ক্ষুদ্র আর সামান্য একটি গোত্র; এত শান-শওকত ওদের কোত্থেকে আসবে।' বুকের ভিতরে জিজ্ঞাসা আর ভীতি দলা পাকিয়ে চলেছে। কিন্তু চোখের সামনে অন্ধকার। কিছুই বুঝতে পারছেন না আবু সুফিয়ান। বহু যুদ্ধের সেনানায়ক, বহু কলহের বিচারক আবু সুফিয়ান বিমূঢ়, বিষণ্ন, বিপন্ন হয়ে চলেছেন অন্তরে অন্তরে। এমন সময়ই তিনি সচকিত হলেন। তাকেই তো কেউ ডাকছে, তার উপনাম ধরে।

‘কে– আবু হানযালা নও?’ আব্বাস (রা.)-এর ভরাট কণ্ঠ ধ্বনিত হলো। আবু সুফিয়ান সে কণ্ঠের সাথে পরিচিত। আব্বাসের উপনাম নিয়ে তিনিও উচ্চারণ করলেন–

‘আবুল ফজল নাকি?’

আব্বাস (রা.) সম্মতি জানালেন। মুখোমুখি হলেন আবু সুফিয়ান আর আব্বাস। কতকালের চেনা-জানা দু’জন। অথচ কি বিস্তর ফারাক আজ তাদের মাঝে। তথাপি আব্বাসের দেখা পেয়ে আবু সুফিয়ানের আশার পেণ্ডুলাম সচল হয়ে উঠলো। কানায় কানায় ভরা মশক উপুড় করে দেবার মতো বুক উজাড় করে কৌতূহলের ভাণ্ডার ঢেলে দিলেন আবু সুফিয়ান– ‘আবুল ফজল! আমার মা-বাবা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক। দোহাই লাগে, বলোতো ভাই– এসব কি দেখছি?’

আব্বাসের হৃদয় থেকে ভরাট কণ্ঠে উঠে এলো জবাব– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তাঁবু গেড়েছেন এখানে। অথচ কুরাইশরা কিন্তু তা জানে না এখনো।’

আব্বাসের জবাব যেন আবু সুফিয়ানের দু’চোখের সামনে অন্য এক পৃথিবী এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। চিন্তার অলিন্দ দিয়েও কখনো এমন একটি দুঃসময়ের খসড়া-কল্পনা তার মাথায় আসেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-র বিরুদ্ধে কত রক্তপাতের অধ্যায় জন্ম দিয়েছেন এই আবু সুফিয়ান। কি নির্যাতন, কি দুর্ভোগ চাপানো হয়েছে সাহাবীগণের উপর! জন্মভূমি থেকে যাদের বিতাড়িত করা হয়েছিলো আট বছর আগে, আজ তাঁরাই এসেছেন। বিজয়ের ঝাণ্ডা নিয়ে তাঁরা এবার মক্কায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু আবু সুফিয়ানের এখন কি করার আছে? দিকভ্রান্ত মরুচারীর সামনে অকস্মাৎ এগিয়ে আসা বেদুইন দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে তার মগজের কোষে কোষে অগুণতি সিদ্ধান্তহীনতা, সীমাহীন দুর্ভাবনা-ভীতি।

সম্ভাবনা, ভীতি ও আকুতির সাথে কাতর হয়ে আবু সুফিয়ান যেন আব্বাসের সামনে আছড়ে পড়েন– ‘আবুল ফজল! এখন কি করা যেতে পারে, দয়া করে বলো।’

ঃ তোমাদের যদি ওঁরা দেখে ফেলেন, তাহলে তোমরা বাঁচবে না। তুমি আমার খচ্চরের পিছনে উঠে বসো। আমি তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র দরবারে নিরাপত্তা চাইবো।’

দিশাহীন ঝড়ের রাতে অপ্রত্যাশিত আশ্রয়ের মতো একটি সমাধান আবু সুফিয়ানকে সিদ্ধান্তে পৌঁছালো। অন্য দু'সঙ্গীকে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সওয়ারীর পিছনে উঠে বসলেন। দর্পিত এক নেতার আর কোন নিরাপদ ঠিকানা রইলো না পৃথিবীর নরম যমীনে। নিরাপত্তার জন্য বেছে নিলেন আপাতত আব্বাস (রা.) -এর সওয়ারীর পিছন ভাগ।

এই 'মাররুয্‌যাহ্‌রান' উপত্যকায় মুসলিম সৈনিকদের কাফেলা এসে ঘাঁটি বানিয়ে নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত আব্বাস (রা.) বেরিয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-র সাদা খচ্চরটি নিয়ে তিনি বের হয়েছিলেন। হাজার হাজার সাহাবীর এই কাফেলা সম্পূর্ণ যুদ্ধের সাজে মক্কায় প্রবেশের আগেই তিনি কুরাইশদের জন্য কিছু করতে চেয়েছেন। কুরাইশ নেতৃবর্গ যদি অনুতপ্ত হয়, যদি রাসূলুল্লাহ (সা.)-র দরবারে এসে কাতর হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইসলামের এই বিশাল বিজয়ের সাথে কুরাইশদের ব্যাপক রক্তপাতও বন্ধ থাকবে। দয়ার একটি বিস্তৃত আকাশ যাঁর হৃদয়, সেই রাসুলে আকরাম (সা.) হয়তো ক্ষমা করে দেবেন বিনাশর্তে, বিনা প্রতিশোধে। এই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। এরপর আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাত, কথোপকথন এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা।

খচ্চর এগিয়ে চলেছে মরুর ঝোপ-ঝাঁড় এড়িয়ে। সামনে আব্বাস (রা.) পিছনে আবু সুফিয়ান। বহুকাল ধরে চেনা পথ, মাঠ, পাহাড়-সবই কেন যেন আজ অন্য রকম ঠেকছে আবু সুফিয়ানের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁবু আর অগ্নি-শিখার সারির ভিতর প্রবেশ করেছে খচ্চর। একজন দু'জন সাহাবী এগিয়ে আসছেন, আগন্তুকের পরিচয় জানতে। আব্বাস (রা.)কে সামনে দেখে ফিরে যাচ্ছেন। পিছনে কে বসে আছে, আব্বাসকে দেখার পর আর কেউ তা তত্ত্ব-তালাশ করেননি। যিনিই আসছেন, দেখছেন– এগিয়ে যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-র খচ্চর, সেই খচ্চরে সওয়ার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সম্মানিত চাচা।

একটি অগ্নিশিখার সামনে দিয়ে এগিয়ে যাবার সময়ই প্রশ্ন ভেসে এলো–'কে'? প্রশ্ন করতে করতে বের হয়ে এলেন উমর (রা.)। প্রথমে আব্বাসকে দেখলেন। তারপরই চোখ আটকে গেলো তাঁর। তিনি চিনতে পারলেন। ইসলামের এত দীর্ঘকালের শত্রু আজ এভাবে নাগালের মধ্যে। প্রচণ্ড রাগ আর ক্রোধে গর্জে উঠলেন তিনি– 'এতো দেখছি আবু সুফিয়ান! আল্লাহ্‌র দুশমন!!

আজ তোমাকে চেপে ধরার সুযোগ এসেছে। কোন চুক্তি বা শর্ত নেই আমাদের তোমার সাথে।'

আল্লাহ্‌র রাসূলের দরবারে ছুটে চললেন উমর (রা.)। এক্ষুণি অনুমতি নিতে হবে আবু সুফিয়ানকে কতল করার। আব্বাস দেখলেন, আয়োজন পণ্ড হয়ে যাচ্ছে। অনুমতি পেয়ে গেলে উমর (রা.) এক মুহূর্ত সময়ও বিলম্ব করবেন না। আব্বাস খচ্চরের গতি বাড়িয়ে দিলেন। আগে ভাগে গিয়ে হাজির হলেন দরবারে-রিসালাতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলেন উমর (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.)-র মুখোমুখি আবু সুফিয়ান, হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)। পৃথিবীর ইতিহাস থমকে যাবার মতো একটি চিত্র। মুখোমুখি আজ সংকট, মুখোমুখি আজ উত্তরণ। থমকানো এই মুহূর্তকে আর থমকে থাকতে দিতে রাজী নন উমর (রা.)। তিনি আবেদন জানালেন আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন। আল্লাহ্‌র এই দুশমনকে কতল করে দেই।' সাহসী যোদ্ধার দাউ দাউ উত্তেজনায় টগবগ করে উঠলেন উমর (রা.)। আব্বাস তখুনি পাল্টা আবেদন রাখলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবু সুফিয়ানকে আমি আমার আশ্রয়ে নিয়ে এসেছি।' ক্ষমা ও দয়ার প্রত্যাশা ঝরে পড়ছে তাঁর আবেদনে।

বিষয় আবু সুফিয়ান। একদিকে উমর (রা.), অন্যদিকে আব্বাস (রা.)। একদিকে অজস্র রক্তপাতের প্রতিদান দেয়ার উদ্দামতায় ক্রমাগত আবেদন, আবু সুফিয়ানের সব বেহিসেবী কাণ্ডের ঘুরে ঘুরে আসা স্মৃতির রক্তজ্বালা করা তাড়না; অন্যদিকে ক্ষমা ও উদারতার আকুতি, রক্তপাতহীন এক শান্তিময় বিজয়ের আহবান। দুজনই ইসলামের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। আরেক দিকে কিংকর্তব্য বিমূঢ় আবু সুফিয়ান-বাকহীন, হতবাক, অপেক্ষমান এবং আরো একটি দিক, প্রশান্ত ও পর্যবেক্ষক; নীরবে, নিঃশব্দে শুধু শুনে যাওয়া। অবশেষে মানুষ ও মানবতার ত্রাতা সেই বিস্ময়কর উদার মানুষ, রাসূলে আকরাম (সা.) বললেন– 'একে এখন নিয়ে যাও– সকালে নিয়ে এসো।'

ভোরের স্নিগ্ধতা মাথায় নিয়ে আব্বাসের সাথে আবু সুফিয়ান রাসূলে আকরাম (সা.)-এর দরবারে হাজির হলেন। আবু সুফিয়ানকে দেখে রাসূলে আকরাম (সা.) তাঁর বিজয়ী কণ্ঠে আশ্বাস আর আহবানের মধু ঢেলে বললেন– 'বড় আফসোস্ আবু সুফিয়ান! এখনও কি তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই?'

আবু সুফিয়ান এই আশ্চর্য সুন্দর প্রশ্নটির সরাসরি জবাব দিতে পারলেন না। তার ভিতরে যে ভাঙন চলছে, এখনো তা চূড়ান্ত হতে পারেনি। তিনি বললেন– 'আমার মা-বাবা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি কত সহনশীল! আপনি কত মহান! আত্মীয়তার বন্ধনকে আপনি কত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন!

আবু সুফিয়ান আরো বললেন–

'কোন সন্দেহ নেই, এখন আমার ধারণা হলো, যদি আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ থাকতো, তাহলে সে আমাদের সাহায্য করতো'।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দেখলেন, আবু সুফিয়ান এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অথৈ জলরাশি ছেড়ে তীরে উঠতে পারছেন না। এবার আরো সরাসরি প্রশ্ন করলেন– 'আবু সুফিয়ান! এখনো কি তোমার বুঝে আসেনি যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল'?

এবার আবু সুফিয়ান আরেকটু কাছাকাছি এলেন তীরের। তার মন ও মগজের ফয়সালাহীনতার উপর থেকে ঢাকনা উঠিয়ে দিয়ে বললেন– 'আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হোক। কি সহনশীলতা! কি দয়া! আর কি মহান আত্মীয়তার সম্বন্ধের-বিবেচনা! কিন্তু এ বিষয়টির ক্ষেত্রে আমার মাঝে এখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে।'

আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানের এই কালক্ষেপণে গর্জে উঠলেন। তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তার গর্দান যে কোন সময়েই উড়ে যেতে পারতো, উড়ে যেতে পারেও। মহানুভবতার সুযোগ সামান্য সময়ের জন্যেও হারানো উচিত নয়। এক আকাশ হিতাকাঙ্খা নিয়ে, ভালোবাসা ও দরদ নিয়ে তিনি তাকে বললেন– 'ইসলাম কবুল করে ফেলো আবু সুফিয়ান।'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এক বিশ্রী দোলনা থেকে শান্তির সমান্তরাল ভূমিতে অবতরণ করতে করতে আবু সুফিয়ান দেখলেন– এ যে এক অনন্য ভুবন! রণাঙ্গণের ঝলসানো ইস্পাত নেই, ক্রোধ-প্রতিশোধের পালা নেই, রক্ত-খুনের পিপাসা নেই। শুধু কিছু দয়ার আদান-প্রদান, মানবতার জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ দরদ এখানে ঢেউ তুলছে। আবু সুফিয়ান প্রখরতাহীন তার দুটি চোখ তুলে দেখলেন– বৃষ্টি ধোয়া স্নিগ্ধ শেষ বিকালের মত নির্মল সেই স্নেহময় মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। নীরব আকাশে ফোটা তারারা যেভাবে কথা বলে, রাসূলুল্লাহ্র নিঃশব্দ

দু'টি চোখ যেন সেইভাবে কথা বলছে তার হৃদয়ের সাথে। মধ্যাহ্ন মরুর বুকে জেগে উঠা ঘূর্ণির মতই সমানে পাক খেয়ে উঠতে থাকলো তার তোলপাড় করা বুকে রাসূলুল্লাহ্‌র এই স্বর্গীয় প্রতিদান। কৈ, তার কাছেতো কোন কৃত কর্মকাণ্ডের কৈফিয়ত চাওয়া হলো না। ভাবনা, ভাবনা এবং সীমাহীন ভাবনার এক পর্যায়ে মহানুভবের ভালোবাসার উষ্ণ পরশ তার হৃদয়ে বিস্তর সমীহের ছন্দ তুললো। এক অপার্থিব বোধের ছোঁয়ায় তার ভিতরের অন্ধকারগুলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হাওয়ায় পাতার মতো দুলতে দুলতে অবশেষে স্থির বিশ্বাসের উপর এসে দাঁড়ালেন তিনি। ভাঙতে ভাঙতে তার অন্তরজগত সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেলো। সদ্যস্নাত আত্মার পবিত্রতা নিয়ে তিনি বলে উঠলেন- 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্।'

পৃথিবীর বিশুদ্ধতম, সত্যতম বাক্যটি উচ্চারণ করলেন আবু সুফিয়ান (রা.)। আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে একজন গোত্রপতি তাঁর দাপট, দর্প সব সঁপে দিয়ে ভেসে চললেন শান্তির সর্বপ্লাবী জোয়ারে।

আশ্চর্য প্রতিদান!

জীবনের সাথে সখ্য ছিলো না, হৃদয়ের সাথে হৃদ্যতা ছিলো না, বিশ্বাসের সাথে ভালোবাসা ছিলো না এবং মানুষের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিলো না, যারা অনায়াস ভঙ্গিতে মরুর বুকে দর্পী চিতার মতো শুধু রক্তছাপ দিয়ে পথ-প্রান্তর কলুষিত করেছে, আজ তাঁদের অনেকেই রূপান্তরিত। হিংস্রতার খোলস ভেঙে-চুরে দেবার পর তাঁরা এখন উপলব্ধি করছেন, নির্বাসিত বিশ্বাস ও ভালোবাসার মায়ায় তাঁদের হৃদয়ের শূন্য সিন্দুকে অজস্র অশ্রুবিন্দু জমা হয়ে চলেছে অবিরত। জান্নাতী নূরের বিভায় অন্ধকারের দন্ত-নখর বিগলিত হয়ে ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। তাঁরা দলে দলে শান্তির মহান দূত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে হাজির হতে শুরু করেছেন।

বিজয়ী একজন বীর মক্কার হৃৎপিণ্ডে এখন সমাসীন। বিজয়ী বীরের বেশ-ভূষা আর ভাব-ভঙ্গির জাহেলী ত্রাসের পরিবর্তে তাঁর অস্তিত্বের চারপাশে

যেন ঝুলে আছে বিনয়, গাম্ভীর্য আর মমতার এক গাঢ় চাদর, যেন দাপাদাপি করছে তাঁর চারপাশে ভোরের অমলিন সুখী বাতাস।

তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন উসমান ইবনে তালহা (রা.)। রূপান্তরের এক মহা উৎসবে তিনিও রূপান্তরিত। তথাপি সংকোচ, দ্বিধা ও শংকায় দোদুল্যমান তাঁর কদম। অন্য দশজনের মতো নিশ্চিন্তির পাহারা তাঁর ভাবনার চারপাশে নেই। আজ তাঁকে আসতে হলো, না আসার কোন অবকাশ, কোন সুযোগ তাঁর ছিলো না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে খবর পাঠিয়েছেন আসার জন্যে।

নবীজীর চারপাশে অনেক সাহাবী বসে আছেন। বসে আছেন নবীজীর চাচা, সাহাবী হযরত আব্বাস (রা.)। উসমান ইবনে তালহা (রা.) নবীজীর মুখোমুখি। তাঁর সামনের মহিমান্বিত মানুষের হাতে আজ তাঁর জীবন সমর্পিত, সমর্পিত তাঁর বিশ্বাস ও উপলব্ধি। অথচ পবিত্র কা'বার চাবি বাহক উসমান কোন এক সময় এই সামনের মানুষটিকেই কা'বা যিয়ারতে বাঁধ সেধেছিলেন। প্রত্যাখাত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিলো তাঁকে। তিনি আজ বিজয়ী। মক্কা শুধু নয়, সমগ্র জাযীরাতুল আরবের হৃৎপিণ্ড এখন তাঁর হাতে, যেমন তাঁর কব্জায় এসে গেছে অগণিত মক্কাবাসী মানুষের হৃদয়-হৃৎপিণ্ড। তিনি আজ উসমানকে ডেকেছেন। অতীতের অন্ধকার উসমান ইবনে তালহাকে ভাবিত করে তুলেছে। কা'বার রাজফটকের চাবি এখনো তাঁর হাতে। সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক এই চাবি আজ তাঁকে কোন্ পরিণতির মুখোমুখি করে, কে জানে!

উসমান ইবনে তালহা এসে বসলেন রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সামনে; শংকিত, দ্বিধাগ্রস্ত ও অনিশ্চয়তার ভারে নুয়ে পড়া সদ্য রূপান্তরিত এক হৃদয় নিয়ে। ভাবগম্ভীর ও দয়ার প্রাচুর্যে ভরাট কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন– 'উসমান! বাইতুল্লাহ্‌র চাবি আমার হাতে তুলে দাও।'

একজন বিজয়ীর মুখে উচ্চারিত একটি নিদের্শ; যেন তা সমান্তরালের কোন মামুলী ব্যক্তির বিনয়ী-বিনম্র আব্দার। উসমানের দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে প্রশান্তির শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়লো। এতো সহজ সমাধান যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, তিনি তা উপলব্ধি করে পুলকিত হলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র দিকে। বহুকাল যাবৎ লুকায়িত গুপ্তধন আবিষ্কারের চমকের মতো সে হাতের তালুতে উজ্জ্বল অবস্থান একটি চাবির।

চাবিসহ উসমানের হাত নবীজীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলেন আব্বাস (রা.)। ত্যাগ, সংগ্রাম, আত্মদান ও মর্যাদা থেকে প্রাপ্ত অধিকারের এক খণ্ড ভাবনার ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে তিনি প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণার কণ্ঠে আবেদন জানালেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার মা-বাপ উৎসর্গিত হোক। এই চাবি আমার হাতে তুলে দিন। তাহলে যমযম থেকে আল্লাহ্‌র অতিথিদের পানি পান করানো আর বাইতুল্লাহর চাবি বহনের মর্যাদা আপনার বংশ বনু হাশিমের অধিকারে এসে যাবে।'

আব্বাস (রা.)-এর গমগমে কণ্ঠে উচ্চারিত এই আবেদন শূন্যে ভাসতে লাগলো, কোন তরী খুঁজে পেলো না। কোন ইতিবাচক উত্তর দিলেন না রাসূলে আকরাম (সা.)। কিন্তু ততক্ষণে উসমানের হৃদয়ে জেগে উঠেছে দ্বিধার ঝড়। তিনি তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন, চাবিসহ। সম্পূর্ণ অসম্মতি নয়, পূর্ণ সমর্পণও নয়। একটি দ্বিধাগ্রস্তবোধ তাঁকে জাপটে ধরে ফেলেছিলো। একটি গোত্রের হাত থেকে সম্মানের একটি প্রতীক আরেকটি গোত্রের হাতে গিয়ে উঠবে, এর জন্য কি তাঁর কোন ত্যাগের প্রয়োজন আছে– এমন একটি প্রশ্ন ও সংশয়ের ঘাম তাঁকে ভিজিয়ে যাচ্ছিলো অনবরত। রাষ্ট্র ও মানুষের মহান সম্রাট স্বয়ং রাসূলুল্লাহর হাতে চাবিটি তুলে দিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই।

একদিকে চাবি হস্তগত করার একটি আব্দার, অন্যদিকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তি ও গোত্রের হাতে চাবি তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় এবং হাত গুটিয়ে নেওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবারো সেই নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ শূন্যে ভেসে উঠার আগেই উসমান ইবনে তালহা (রা.)-র হাত সচল হয়ে উঠলো। চাবি ধরা হাতটি মেলে ধরলেন তিনি নবীজীর দিকে। আবারো আব্বাস (রা.) জানালেন তাঁর আবেদন এবং উসমান ইবনে তালহার হাত আবারো গুটিয়ে এলো।

গুমোট বাঁধা ও অস্বস্তিকর অস্থির বাতাস যেন সকলের দিকে কৌতূহলী চোখের পাপড়ি উঁচিয়ে ধরলো।

তৃতীয়বার উচ্চারিত হলো রাসূলুল্লাহ্‌র মুখে নির্দেশ। তিনি উসমান ইবনে তালহার দিকে তাকিয়ে বললেন– 'উসমান! আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর

তোমার ঈমান থাকলে চাবি আমার হাতে তুলে দাও।' উসমানের দ্বিধাগ্রস্ত বুকে যেন অনুশোচনার অজস্র তীর হয়ে এই নির্দেশের বাক্যমালা বিঁধে গেলো। তিনি এবার হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাত আর গুটিয়ে নিলেন না। নবীজীর হাতে চাবি তুলে দিয়ে বিনয়ে পোড় খাওয়া মোমের মতো, বিগলিত কণ্ঠে বললেন– 'আল্লাহ্র আমানত গ্রহণ করুন।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) চাবি হাতে নিলেন। পবিত্র কা'বার তোরণ খুললেন। যিয়ারত করলেন। রাশি রাশি পৌত্তলিক অপবিত্রতার স্তূপ পরিষ্কার করালেন। তাওয়াফ ও দুআ করলেন। তারপর আবার উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠালেন।

উসমান ইবনে তালহা (রা.) এবার এসে হাজির হলেন অনেক বেশি বিগলন, অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও অনুশোচনা নিয়ে। সাহাবীগণ দেখছেন, কা'বার চত্বরে রূপান্তরিত, ইসলামে সদ্য দীক্ষিত মানুষের দল দেখছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) উসমানের দিকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সে হাতের তালুতে মুক্তার মতো বিস্ময় কেড়ে শুয়ে আছে কা'বার চাবি। এভারেষ্ট নয়, মানবিক উদারতার এক অনুদঘাটিত শৃঙ্গ থেকে শুভ্র ঝর্ণার অবিরত ঝরে পড়ার মত রাসূলুল্লাহ (সা.)-র মুখ থেকে নিসৃত হলো অদ্ভুত, বিস্ময়কর কয়েকটি শব্দ– 'উসমান! এই নাও তোমার চাবি। এই চাবি তোমার হাতে ছিলো। এখন তোমার হাতে, পরবর্তীতে তোমার বংশধরদের হাতে থাকবে। আজ প্রতিশ্রুতি পূরণ ও পুণ্যের দিন।'

এমন বিস্ময়কর উদারতার সাথে অপরিচিত মরুজীবন, মরুবাসী মানুষের চোখ, সমকালীন দুনিয়ার সভ্যতার পর্যবেক্ষণী ফোকাস্ যেন থমকে গেলো, হোঁচট খেলো এবং অভিবাদনের ভঙ্গিতে নুয়ে পড়লো এক সঙ্গে।

উসমান ইবনে তালহা (রা.)-র হাতে উঠে এলো সেই চাবি। হিরকখণ্ডের মতই অমূল্য সেই চাবি হাতে পাওয়ার পর তাঁর নবদীক্ষিত আত্মা যেন অনেক, অনেক বেশি পরিণত ও বিধৌত হয়ে উঠলো। চাপ চাপ খুশীর বহু বর্ণ-রঙ তাঁর হৃদয়ের চারপাশে ছুটিয়ে চললো এক ভুবন বিজয়ী উপলব্ধির ফোয়ারা।

আশ্চর্য এক প্রতিদানের উপমা ঝুললো পৃথিবীর উপমাশূন্য উপমা-তালিকার শীর্ষে।

পবিত্র যন্ত্রণা

অবশেষে কামরায় ঢুকে পড়লেন উমর (রা.)। আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। অপেক্ষার প্রয়োজনও ছিলো না। একবার, দু'বার এবং তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কামরার ভিতরে এসে হাজির হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্র মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য বিপুল বেচাইনির ঝড়ে তিনি আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্যরকম একটি ভার ভার যন্ত্রণা ও কষ্ট তাঁকে কুঁকড়ে তুলছিলো। উমর (রা.) তাঁর বিনীত দু'টি চোখ, সমব্যথি ও কাতর দু'টি চোখ মেলে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দড়ির খাটিয়ার উপর শুয়ে আছেন। নির্জনে, নিঃশব্দে একটি ঘরে তাঁর এই শুয়ে থাকা দেখে উমরের হৃদয়ে অসম্ভব কষ্টের তুষারপাত শুরু হলো। দুঃখের এক পশলা হাহাকার তার অন্তর আর্দ্র করে তুললো। কী বলবেন, কী করবেন, কোন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। প্রশ্ন, কৌতূহল আর কষ্টের ধারালো অনুভবগুলোই তাঁর, এখানে এসে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

গতরাতে রাসূলুল্লাহর একটি ব্যক্তিগত কষ্টের কথা, দুঃখের কথা, মনোযাতনা ও যন্ত্রণার কথা শুনে উমরের ব্যাকুলতা রাতের ঘুমে নিরন্তর আঘাত করেছে। ফজরের জামাতে এসে তিনি দৌড়ে শামিল হয়েছেন মদীনায়। জামাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সময়ক্ষেপণ না করে আবারো নির্জন অন্দরে চলে আসায় উমর (রা.) বিহবল হয়ে মসজিদে বসেছিলেন কিছুক্ষণ। মাঝে দু'বার এসে অনুমতি চেয়েছিলেন; অনুমতি মিলেনি। অবশেষে এক বুকফাটা-আব্দার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-র দরবারে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং এরপর তিনি কামরায় ঢুকলেন।

উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-র মুখোমুখি হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে দেখছিলেন। তাঁর পারিবারিক একটি সংকটে, দাম্পত্যের একটি সমস্যায় তিনি কতোটা কষ্টের মধ্যে আছেন, সবার অগোচরে, কতোটা নিঃশব্দ দুঃখের মধ্যে

প্রহর কাটছে তাঁর, উমর (রা.) সম্ভবত তা-ই লক্ষ্য করছেন। উমর (রা.) তাঁর দু'চোখ মেলে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দেখলেন। দেখলেন, সাধারণ একটি দড়ির খাটে শুয়ে আছেন তিনি। তাঁর গায়ে দড়ির দাগ পড়ে গেছে। কোমল ত্বকে দারিদ্রের নিষ্ঠুর আঁচড়ের মতই সেই দাগ জ্বল-জ্বল করছে। উমর (রা.) দেখলেন আসবাবপত্রহীন, আয়োজনহীন, বিত্তহীন এই কামরার একপাশে রাখা আছে সামান্য যব; আরবের মোটা খাবার। আরেক পাশে একটি খুঁটিতে ঝুলছে সামান্য একটি পশুর চামড়া। উল্লেখ করার মতো তেমন আর কোন আসবাবপত্র ঘরে নেই।

দেখতে দেখতেই উমরের বোধগুলো ঝাপসা হয়ে এলো। মুষলধারে নেমে আসা বৃষ্টিতে হঠাৎ আক্রান্ত পথিকের মত উমরের হৃদয় কাকভেজা হয়ে গেলো। নিয়ন্ত্রণের শক্ত পিঞ্জর ভেঙে গেলো তাঁর। উমর (রা.) ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতেই লাগলেন। দু'চোখ বেয়ে বিন্দু বিন্দু কষ্টের ভাঁপ কপোল বেয়ে নেমে আসতে লাগলো। উমর (রা.) এক সীমানাহীন ভালোবাসার ভুবন, হাহাকারের ভুবন, পবিত্র যন্ত্রণার ভুবনে বন্দী হয়ে গেলেন।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরার মতো উমরের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে দেখে অসম্ভব কোমল কণ্ঠে বিপুল সান্ত্বনার আবেশ ছড়াতে ছড়াতে রাসূলে আকরাম (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন– 'উমর! তুমি কাঁদছো কেন?'

দিশেহারা কান্নার মাঝেও অশ্রুপাতের অবিরল ধারার মধ্যেও উমর আরয করলেন- 'এছাড়া আমার কান্নার আর কী কারণ থাকতে পারে যে, রোম সম্রাট আর পারস্য সম্রাট পৃথিবীর প্রাচুর্য ভোগ করছে। অথচ নবী হয়ে আপনার এই দারিদ্র্য!'

সম্পূর্ণ পাত্র উপুড় করে দেয়ার মতই উমর তাঁর ভালোবাসা ও কষ্টের, দুঃখ ও যন্ত্রণার আদ্যোপান্ত উপুড় করে দিলেন। তাঁর নিঃশব্দ হাহাকার প্রচন্ডভাবে বিস্ফোরিত হলো। মানবতার, সহানুভূতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে যার আয়েশী অবস্থান, সেই রাসূলে আকরাম (সা.) সব শুনলেন, দেখলেন। তাঁর এক প্রেমিক সহচরের হৃদয় উজাড় করা কান্নায় তিনি অভিভূত হলেন। তিনি এক অনন্য অভিব্যক্তি শূন্যে ছেড়ে দিলেন। দৃশ্যমান বাস্তবতার ঊর্ধ্বে, সংকীর্ণ ইহকালীনতার বাইরে এক দিগন্তহীন দিগন্ত থেকে তিনি উচ্চারণ করলেন– 'উমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, রোম-সম্রাট ও পারস্য-সম্রাট পৃথিবীর প্রাচুর্য ভোগ করুক আর আমি পরকালের ক্ষয়-লয়হীন অনাবিল শান্তি লাভ করি?'

অশ্রুসিক্ত উমরের দু'চোখ স্থির হয়ে আছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-র অদ্ভুত প্রশান্ত মুখের উপর। এ প্রশ্নের জবাবে তাঁর নিজের মুখে কোন শব্দ নেই। তিনি শুধু শান্তির অনাবিল প্রতীক এই মুবারক মুখের আদলে শান্তির মানচিত্র খুঁজে নিচ্ছেন। তাঁর বুকের মধ্যে জমে যাওয়া কষ্টের পালকগুলো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে দূরে, অন্যখানে।

স্বাগতম ইকরামা!

আকাশ এখন মেঘমুক্ত। স্বচ্ছ, নির্মল ও শুভ্র, আদিগন্ত বিস্তৃত এক শামিয়ানা যেন পৃথিবীর ছাদ হয়ে ঝুলে আছে। সেই শামিয়ানার নিচে বৃষ্টির শীতল, জুড়ানো ঘ্রাণের মতো নিশ্চিত নিরাপত্তার সতেজ প্রবাহ। সংক্রামক প্রতিশোধের রক্তঘ্রাণ এখন নির্বাসিত। বিশ্বাস ও ভালোবাসার আগুনে বিশুদ্ধ ও পরিণত হয়ে উঠেছে সকলের আত্মার তশ্‌তরী। ইসলাম তার দুই দশক অতিক্রম করে এখন অনেক বেশি অজেয় এবং প্রচণ্ড। বিস্ময়কর উদার ও মানবিক; যথারীতি।

সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বসে তাঁর কথা শুনছেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের সমুদ্রে তরঙ্গ বিস্তার করে চলেছেন তিনি। আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা আসছেন। ইসলামের শুরু থেকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত যে ইকরামা ছিলেন ইসলামের প্রতিপক্ষে এক দুরন্ত শক্তি, সেই ইকরামা পলাতক অবস্থা থেকে আত্মসমর্পণের জন্য এগিয়ে আসছেন। তাকে যেন কেউ আবু জেহেলের প্রসঙ্গ তুলে কিছু না বলেন, তার নিরাপত্তা যেন কোনভাবেই কোন আবেগপ্রবণতার আঘাতে বিক্ষত না হয়, তার জন্যই সকলের মুখোমুখি কিছু কথা বলছেন আল্লাহর রাসূল, পৃথিবীর বিস্ময়কর দয়াবান মানুষ।

মজমার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছেন ইকরামা। সঙ্গে তার স্ত্রী উম্মু হাকীম (রা.); কিছুদিন আগেই যিনি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর বিপথগামী ফেরারী স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। ইকরামা, সাহাবীগণের দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত শত্রু। তাই কেউ কেউ নিরুত্তাপ। কিন্তু দয়ার এক জীবন্ত আকাশ,

ক্ষমার এক প্রাণোচ্ছল সাগর, প্রেমের এক সবসওয়া যমীনের মত বিশাল হৃদয় নিয়ে সাড়া দিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। দৌড়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। পরাজিত, পলাতক ও সমর্পিত শত্রুর প্রতি এগিয়ে গেলেন উচ্ছ্বসিত ভালোবাসায়। তাঁর গায়ের চাদর পড়ে রইলো পিছনে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। তারপর ইকরামাকে নিয়ে এসে বসালেন সামনে। নিঃশব্দ অভ্যর্থনা আর স্বাগতম জানানো হলো ইকরামাকে।

রাসূলে আকরামের মুখোমুখি ইকরামা। পাশে তার স্ত্রী নেকাবে ঢাকা হয়ে বসে আছেন, নীরব। ইকরামাকে তার স্ত্রী ইতিপূর্বে জানিয়েছেন, আল্লাহ্র রাসূলের দরবার তাকে নিরাপত্তা দিবে। কিন্তু তার জন্য এতটা সম্মান, এ পরিমাণ হৃদয়জাত ভালোবাসা কি আশা করা যায়? শত্রুর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই যে কালচার রক্তের ভাষায় কথা বলে, সেখানে নিরাপত্তার আশ্বাস থাকলেও তো, রক্তের কিছুটা গন্ধ থাকতে পারে, কিছুটা শ্লেষ, ব্যঙ্গ কিংবা অপমানজনক কোন শর্ত? কিন্তু এ অপরিণত ভাবনারা এখানে এসে দারুণ ভাবেই যেন চমকে গেলো। ইকরামা বিনীত স্বরে মুখ খুললেন– 'মুহাম্মদ (সা.)! উম্মু হাকীম আমাকে জানিয়েছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।'

ইকরামার স্বরে প্রশ্নের স্পর্শ আছে। তিনি নিশ্চিত হতে চান, অবিশ্বাস্য এই উদারতা কতখানি বাস্তব। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) পাপ আর অপরাধের নোংরা পাটাতনে ক্ষমা ও দয়ার পরিচ্ছন্ন ঝর্ণা বইয়ে দিলেন। আশ্বাসকে নিশ্চয়তায় পরিণত করে ঘোষণা করলেন– 'উম্মু হাকীম সত্য বলেছে। তুমি এখন নিরাপদ।'

আরবের এক গোত্রপতির সন্তান, অভিজাত যুবক ইকরামা। নিজেও নেতৃত্বের শিখরে অবস্থান করে কুরায়শদের পরিচালনা করেছেন। আজ তার জীবন যে অমলিন দিগন্তের সন্ধান পেলো, আলোর যে অনিশেষ ফোয়ারার সাক্ষাত পেলো, তাতে অতীতের দীর্ঘ পথপরিক্রমাকে নিছক অন্ধকারের এক বদ্ধ গলিপথে বারবার ব্যর্থ বিচরণ বলেই মনে হলো তার। তিনি বিশ্বাসের এক চূড়ান্ত ফয়সালায় গিয়ে পৌঁছলেন। আনুগত্য, অনুশোচনা আর বিনয়ে অবিরত ভাঙতে থাকা এক কোমল স্বর তার মুখে উঠে এলো। তিনি লজ্জকাতর মাথাটি নুইয়ে দিয়ে আরয করলেন– 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্

নেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আপনি তাঁর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আপনি শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান, সৎ, সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী মানুষ।'

ইকরামার মুখে স্বীকৃতি ও স্বাক্ষ্যের সুমহান বাক্যমালা উচ্চারিত হলো। দীর্ঘকালের এক শত্রু আজ ইসলামের আলোকিত ভুবনে এসে ঠাঁই নিলেন। মজমার বাতাসে যেন পুঞ্জীভূত সৌরভ এক সঙ্গে পাখা মেলে দিলো উল্লসিত প্রজাপতির মতো। আল্লাহ্‌র রাসূলের দয়ালু চেহারায় উঠলো অপার্থিব খুশির ঝিলিক।

দীক্ষিত ইকরামা (রা.)-র এবার নতুন পথে চলার সময়। হারানো মানযিল তাঁর পাওয়া হয়ে গেছে। তাঁর এখন দ্রুত, অতি দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে আরো। তিনি আরয করলেন আবার– 'আমাকে কোন উত্তম কালেমা শিখিয়ে দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

নবীজী বললেন– 'কালেমায়ে শাহাদাত-ই তো সর্বোত্তম কালেমা।'

ইকরামা (রা.) যেন অনেক বেশি পরিণত হয়ে গেছেন কয়েক মুহূর্তেই। তিনি আবারো আবেদন জানালেন। তাঁর মনোভাব ও আকাঙ্খা গুছিয়ে তুলে ধরলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আরো কিছু উপদেশ দিন।' ইকরামার ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হয়েছেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। তিনি সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে বললেন– 'বলো, আমি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করছি আল্লাহকে এবং উপস্থিত প্রত্যেক কে এ বিষয়ে যে, আমি একজন মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির।'

ইকরামা (রা.) এই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন। ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের উপর নিজের আস্থার সশব্দ প্রকাশে নিজেও আনন্দিত হলেন। পুলকের আধমেলা কোড়ক–কলি যেন সব পাপড়ি মেলে ধরলো।

জীবনটাকে একবার হারিয়ে আবার পাওয়ার দিন আজ, ইকরামার জন্য। ক্ষমা ও উদারতার যে পথ তার জন্য উন্মোচিত হয়েছে, সে পথে ছুটে চলার দিন, বিপথের গহ্বর থেকে উত্তরণের দিন। আজ অসম্ভব– অসামান্য প্রাপ্তির দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন– 'আজ তুমি কি চাও ইকরামা! বলো আমাকে। আমি তা পূরণ করবো।'

রাজ্যহারা, দর্পহারা এবং গোত্রহারা গোত্রপতি ইকরামার জন্য ইসলামের সুশীতল পরশ এতই আনন্দঘন, এতই প্রফুল্লতাদায়ক হবে, কেউ ধারণা করেন নি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর যে কোন আব্দার পূরণ করবেন বলে কথা দিয়ে ফেললেন। আজ ইকরামার কি চাই? কি দরকার? আজকের আগেও যে উদ্ভট জীবনবোধ ও বিক্ষত চেতনা তার মনন ও মগজে লালিত হতো, তাতে হয়তো পার্থিব ভোগ-বিলাসের অনেক কিছুই চাওয়া যেতো, পূরণের নিশ্চয়তা থাকলে, যা এখন আছে। আজ কি চাইবেন তিনি? হ্যাঁ, আজকেই সুদীর্ঘ অন্ধকারের ক্ষমা চাওয়ার উপযোগী ও উত্তম দিন। আজ প্রার্থনার যোগ্য এই একটি জিনিসই প্রার্থনীয়, অন্য কিছু নয়। ইকরামা (রা.) বললেন, পিতার কাছে আহ্লাদী স্বরে শিশুর অবিরত আব্দারের মতো– 'আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, যেন আপনি আমার সকল অপরাধের মাফের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন। আপনার যত শত্রুতা করেছি, আপনার বিরুদ্ধে যত প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি, আপনার বিরুদ্ধে যত লড়াই করেছি এবং আপনার সামনে বা পিছনে যত অশোভন কথা আমি আপনাকে বলেছি, সব কিছুই যেন আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দেন, সেজন্য আপনি দুআ করবেন, আমি এটাই চাই।'

ইকরামার অনুশোচনা-দগ্ধ হৃদয় যেন এই আব্দারে সম্পূর্ণ উপুড় হয়ে পড়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)–র সামনে। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন অনুতপ্ত নতুন মুসলিমের সকল গর্হিত অতীতের ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে হাত তুললেন এবং ইকরামার আব্দার রক্ষা করে আল্লাহ্র কাছে ইকরামার সকল গুনাহ্-খাতা-গুস্তাখীর ক্ষমার আবেদন জানালেন।

আনন্দে উৎফুল্ল, রূপান্তরিত মানুষ, আলোকপ্রাপ্ত, বিশ্বাসে ধন্য কুরায়শ নেতা ইকরামা (রা.) বললেন–'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এখন প্রশান্তি এসে গেছে।'

এরপর প্রত্যয়, বিশ্বাস ও দৃঢ়তার এক আকর্ষণীয় উচ্চতা থেকে ইকরামা বহু বহু উচ্চতায় সমাসীন শ্রেষ্ঠতম রাসূলের কাছে, সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবাণী উচ্চারণ করলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি শপথ করছি! যত অর্থ আমি আল্লাহ্র পথে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য ব্যয় করেছি, তার দ্বিগুণ অর্থ আমি আল্লাহ্র পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যয় করবো। যত যুদ্ধ আমি আল্লাহ্র রাস্তার বিরুদ্ধে করেছি, তার চেয়ে দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি আল্লাহ্র পথে করবো।'

প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতির এক আশ্চর্য সুন্দর অভিব্যক্তি যেন মরুর আকাশে শ্বেত কপোতের মতো ডানা ঝাপটিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলো। পৃথিবীর একপ্রস্থ ইতিহাস হঠাৎ করেই যেন বিশাল, ভারী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। হযরত ইকরামা (রা.)-কে স্বাগত জানালো বেহেশতী খুশবু।

বিধৌত অনুভব

একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। বনু হানীফা গোত্রের অন্যতম সরদার বন্দী হয়ে আছেন, হাত-পায়ে মজবুত শৃঙ্খলের গিঁট। দাপট আর প্রাচুর্যের তাবৎ উপলব্ধি তার, হামাগুড়ি দিয়ে চলছে মাটির শরীর বেয়ে। ক্ষমতার, দ্বন্দ্বের আর বিরোধিতার নষ্ট আয়োজন আশু ফয়সালার অপেক্ষায় ধীরে ধীরে ত্রস্ত, ভীত হয়ে উঠছে।

সুমামা ইবনে উসাল তার নাম। তিনি মসজিদে নববীতে বসে অপেক্ষা করছেন। ইয়ামামার এই গোত্রপতিকে ধরে আনা হয়েছে। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে ক'জন জানবায সাহাবী তাকে ধরে এনে বেঁধে রেখেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে, সততা ও মানবতার শাশ্বত পয়গামের বিরুদ্ধে এই গোত্রপতির ভূমিকা ও তৎপরতা বেশ কদিন ধরেই আল্লাহর রাসূলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এরপর সরাসরি নির্দেশ এবং ঘোড়সওয়ার একদল সাহাবীর অভিযান; ধৃত সুমামা এখন তাই মসজিদে নববীতে বন্দী। বন্দিত্বের অসহায় মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে বড়বেশি মনোকষ্টে, অনুতাপে আর অপেক্ষায়। কি সিদ্ধান্ত যে তার ব্যাপারে হবে, কেউ জানেনা। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) কি সুমামার সাথে সাক্ষাত করবেন? মুখোমুখি হবেন? শাস্তি ও পরিণতি নিজ মুখে শুনাবেন?

কৌতূহল আর অপেক্ষার পদচারণার পথ রুদ্ধ হলো। তিনি এলেন, স্বয়ং। শাশ্বত শান্তির কথা, মুক্তি ও বিশ্বাসের বাণী, যাঁর মুখ থেকে শুনে জাযীরাতুল আরবের মরু সাহারায় ঝর্ণার প্রস্রবণ ছুটেছে অজস্র ধারায়; স্বয়ং সেই রাসূলে

আরাবী (সা.) সুমামার মুখোমুখি হলেন। এতোদিনকার শত্রুর বন্দিত্বের মুখোমুখি হয়ে তিনি বললেন–

'তোমার কথা কি সুমামা?'

বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর এই প্রশ্নে সুমামা কি আশ্বস্ত হলেন? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কি তার বেড়ে গেলো? অনুতাপ ও অপরাধ বোধ ....?

সুমামা বললেন–

'আমার কাছে ভালো কথাই আছে হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য একজনকেই হত্যা করবেন। আর অনুগ্রহ করলে আমাকে কৃতজ্ঞ হিসেবেই পাবেন। অবশ্য মুক্তিপণ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে আপনি যা ইচ্ছা বলুন– আমি দেবো।'

সুমামার অপরাধবোধ ও আত্মস্বীকৃতিমূলক এই জবাব শুনলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। সুমামার অনুতাপ ও শুভ ভবিষ্যতের প্রত্যাশা লক্ষ্য করলেন দোজাহানের সম্রাট। সেদিনের মতো আর কিছু না বলে বেরিয়ে এলেন তিনি।

দ্বিতীয় দিন আবার এলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। সুমামার মুখোমুখি হয়ে আবার সেই প্রশ্ন। সুমামার অন্তকরণে কি অনুতাপের বরফ শুধু গলেই চলছিলো? কল্যাণের সুবিমল হাতছানি কি তাকে আরো বেশি আকুল করে তুলছিলো? 'তোমার কথা কি সুমামা?' রাসূলুল্লাহ্‌র এই প্রশ্নে সুমামা ঝটপট বললেন– 'আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, দয়া করেন, তাহলে আমাকে কৃতজ্ঞ রূপেই পাবেন।'

রাসূলুল্লাহর উদার বুকের সামনে সুমামার আকুলতা বিগলিত বরফের মতো বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো। সত্যের প্রতি তার সমর্পণের প্রস্তুতির ইঙ্গিত ধীরে ধীরে আরো প্রকাশ্য হয়ে উঠতে চাইছিলো। বিশাল আকাশের কোলে এক খণ্ড শুভ্র মেঘ খুঁজছিলো তার অস্তিত্ব ধারনের ঠিকানা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বিতীয় দিনেও কোন সিদ্ধান্ত দিলেন না। কোন রূঢ় পরিণতির কথা চাবুকের মতো সুমামাকে বিক্ষত করলো না। দোজাহানের সরদার তো তা চাননি। একটি কঠিন ঘোষণা করলে কিংবা সরাসরি মৃত্যুর পরোয়ানা ঝুলিয়ে দিলে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে সুমামার কিচ্ছু করার শক্তি

নেই, জেনেও তিনি ফয়সালা বন্ধ রাখলেন। তিনি চলে গেলেন সুমামার সামনে থেকে।

তৃতীয় দিন এসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সুমামার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। 'আজ তোমার মতামত কি সুমামা?'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের এই একটি মাত্র প্রশ্নে সুমামা নতুন আর কোন কথাই বলতে পারলেন না, বললেন না। তিনি শুধু বললেন, 'আগে যা বলেছি, এখনও সেটাই আমার কথা।'

সরাসরি আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি তৃতীয়বার, তৃতীয় দিনে উচ্চারিত হলো। সত্যের আলোকিত রাজপথে আরো এক সাহসী পথিকের আগমন ধ্বনি বেজে উঠলো। মিথ্যার অমানিশার চাদর সরিয়ে দেয়ার জন্য আরো একটি দ্বাদশী চাঁদের উঁকি-ঝুঁকি পরিলক্ষিত হলো। সুমামার মতো একজনকে এই সুযোগ তো আল্লাহর রাসূল দিতেই চান, দিয়েছেন যেভাবে অজস্র ইসলাম বিরোধীকে ইসলামের সুশীতল শান্তির ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে, যেভাবে শত্রুকে পরিণত করেছেন উৎসর্গিত সহচরে, নিখাদ বন্ধুতে। তাই ভরাট আশ্বাসের গলায় তিনি বললেন–

'মুক্ত করে দাও তোমরা সুমামাকে।'

তিনদিন আগের বন্দী গোত্রপতি শৃঙ্খলমুক্ত হলেন। দাঙ্গামুখর আরবের রক্তখেলায় অসম্ভব একটি বাস্তবতার ধাক্কা লাগলো তার গায়ে। এত শত্রুতা, এত বিরোধিতা আর এত রক্তারক্তির পর সামান্য প্রশ্নোত্তরে, বিনা চুক্তিতে মুক্তি দান! আরবের জাহেলী জীবনাচার একি দেখলো! বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাওয়া সময়ের এক চমকানো মুহূর্তে সুমামা সচল হয়ে উঠলেন। পাশের এক স্বচ্ছ পুকুরে গিয়ে গোসল করলেন তিনি। দীর্ঘ অতীতের স্তূপীকৃত পাপের জঞ্জাল পরিষ্কার করার এই প্রয়াস। গোসল সেরে ত্বরিৎ মসজিদে নববীতে এসে হাজির হলেন।

তারপর?

বন্দী সুমামার স্থলে মুক্ত সুমামার গোসল সমাপ্ত দেহ।

মসজিদে নববীতে ধরে আনা সুমামার বদলে স্বেচ্ছায় উপস্থিত সুমামা। তিনদিন পূর্বের সুমামার জায়গায় তিনদিন পরের সুমামা।

অনেকগুলো পরিবর্তন; বেশ কিছু রদবদল।

তারপর?

তারপরই সুমামার অন্তকরণে ঘটলো মহা বিপ্লব। পরিশুদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা আর পবিত্রতার এক জগতজুড়া আকাশের স্বচ্ছ কোলে আশ্রয় নিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন–

'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্।'

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘোষণাটি উচ্চারিত হলো সুমামা ইবনে উসাল (রা.)-এর কণ্ঠে। আলোর দাপটে অন্ধকারের রাত্রি পালালো। ভোরের বিমল সমীরণে পৃথিবীর পরিবেশ হলো বিধৌত। পবিত্রতার এক সর্বপ্লাবী বন্যায় ধুয়ে-মুছে উবে গেলো নর্দমার ক্লেদ-কাদা। সুমামা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। শান্তি, সততা, মানবতা, সত্য ও শাশ্বত বিশ্বাসের পথে আরো একজন রাহগীর তার কদম ফেললো বুক ভরা প্রত্যয়ে। মহান পরাক্রান্ত আল্লাহ্র দরবারে সিজদাগামী হলো আরো একটি মস্তক। সত্যসেনানীদের সারিতে ঝলছে উঠলো আরো একটি খাপমুক্ত তলোয়ার।

আল্লাহ্র রাসূল (সা.) দেখলেন– সুমামার সত্যাগ্রহী মুখ, অনুতাপ-দগ্ধ একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর অবনত অস্তিত্ব। মুখোমুখি দুজন; একসাথে একাকার দুটি বিশ্বাস। সুমামা (রা.) আরো কথা বলে চললেন। সত্যগ্রহণের উচ্ছাস ও আবেগ তাঁর উথলে উঠলো– 'আল্লাহর কসম! আগে আপনার চেহারার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন চেহারা ছিলো না আমার কাছে। অথচ আজ আপনার পবিত্র চেহারা আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় চেহারা।

আল্লাহ্র কসম! আগে আপনার ধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন ধর্ম ছিলো না আমার কাছে। অথচ আজ আমার সর্বাধিক প্রিয়, একমাত্র প্রিয় ধর্ম হলো আপনার ধর্ম।

আল্লাহ্র কসম! আগে আপনার এই নগরীর চেয়ে নিকৃষ্ট কোন নগরী ছিলো না আমার কাছে। অথচ আজ আপনার নগরীই আমার সবচেয়ে প্রিয় নগরী।'

সুমামা ইবনে উসাল (রা.) এরপর মক্কায় গিয়ে উমরা করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ ও অনুমোদনে যখন সুমামা (রা.) মক্কায় গেলেন, পূর্ব পরিচিত অবিশ্বাসীরা তখন তাঁকে লজ্জা দিতে চাইলো। তারা বললো– 'সুমামা তুমিতো ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে।'

দ্বিধাহীন সুমামা (রা.) বিশ্বাসের আলোকিত আকাশ থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের পরিষ্কার অবস্থানের মতো বললেন– 'না-তো। আমি ধর্মত্যাগী হইনি। আমি সবেমাত্র ধর্ম গ্রহণ করেছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনে।'

এক কালের ইসলামের চরম শত্রু সুমামা ইবনে উসাল (রা.) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন, ইসলামের উপর অবিচল থেকে জীবন পার করলেন।

অনন্য উপলব্ধি

পূর্বাকাশে নরম সূর্যের মতো তাঁর অবস্থান। সবার মাঝে তিনি বসে আছেন। সাহাবীগণ তাঁর আশপাশে, মুখোমুখি। আলোর চারপাশে আলোপিয়াসীদের তৃষ্ণার্ত উপবেশন। ভোরের স্নিগ্ধ সৌরভের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ পবিত্রতা মজমাকে ঘিরে রেখেছে। তিনি সকলের দিকে চোখ ফেলছেন, কথা বলছেন, শুনছেন কারো কারো কথা! তাঁর খুব কাছাকাছি বসে আছেন এক সাহাবী; যার গায়ের রঙ ঘোরকৃষ্ণ। অদূরে অন্য অনেকের মাঝে আছেন আবু যর (রা.)।

অকস্মাৎ আবুযর, কালো বর্ণের সেই সাহাবীকে বললেন– 'হে কৃষ্ণাঙ্গের সন্তান!' আবুযর (রা.) কথাটি বললেন স্বভাব ও সমাজের স্বাভাবিক বোধ থেকে। আবুযর (রা.) কথাটি উচ্চারণ করলেন সমকালীন বাস্তবতার নির্দোষ উপলব্ধি থেকে। মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া তাঁর এই অভিব্যক্তিতে কোন খুঁত থাকতে পারে, কথাটিতে কোন অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য থাকতে পারে, ভাবেননি আবুযর (রা.)। কারণ, এমনতো হরহামেশাই হচ্ছে। যাদের গায়ের রঙ কালো, ঘোর

কালো, তাদেরকে লোকে সামান্য খোঁচা দিয়েই 'কালোর কালোত্ব' মনে করিয়ে দেয়। কালোরা সেটাই হজম করে নেয়। আবুযর (রা.) তাই করেছেন, এরচেয়ে বেশি তো কিছু নয়।

কিন্তু ভোরের শান্ত আকাশ হঠাৎ করেই মেঘে মেঘে ছেয়ে যাওয়ার মতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় চেহারা অন্ধকার হয়ে গেলো। অসহ্য কষ্টের ছাপ, অসঙ্গত ও অনুচিত কিছু একটা ঘটে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া সেই চেহারার মুবারক আদল দখল করে নিলো। তিনি নারাজ হলেন। প্রচলিত সভ্যতা আর জাহেলী সংস্কৃতির ধরা-ছোঁয়ার বহু ঊর্ধ্বে মানবিকতার এক অমলিন ফরাসে যার অবস্থান, সেই রাসূলে আকরাম (সা.) আবুযরের এই একটি উক্তিতে বেদনাহত হলেন। নীরব অসন্তুষ্টির ক্ষুদ্র সরোবরে ডুব দিয়েও থাকলেন না তিনি। লক্ষ্যভেদী আশ্চর্য মায়াবী দু'টি চোখ তিনি আবুযরের দিকে মেলে ধরলেন। এরপর শান্ত সমুদ্রের মতো গম্ভীর স্বরে তিনি কথা বললেন– 'পাত্র ভরে দাও! সবাইকে সমান দাও! কাউকে খাটো করো না।' তার কথা স্পষ্ট নির্দেশ হয়ে, অলংঘণীয় ফরমান হয়ে শূন্যে আন্দোলিত হলো।

তিনি আরো বললেন– 'কোন কৃষ্ণাঙ্গের সন্তানের উপর শ্বেতাঙ্গের কোন সন্তানের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

ছোট্ট একটি ফরমান। অনভ্যস্থ পরিবেশে এই ফরমান এক কঠোর চাবুকের মত দুলে উঠলো। সেই কথার চাবুক দুলতে দুলতে গিয়ে লাগলো আবুযরের গায়ে, মাথায়, বিবেক ও বোধে। আবুযরের চিন্তা-চেতনার রুদ্ধ দুয়ারগুলো মুহূর্তেই খুলে গেলো। রাশি রাশি আলোর বিন্দু এসে ঢুকলো মগজের দীর্ঘ অন্ধকারে। আলোয় আলোয় দিশেহারা হয়ে গেলেন আবুযর; সত্যকণ্ঠ আবুযর (রা.)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)–র মুখনিসৃত বাক্যটি শূন্যে এসে আন্দোলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবুযর (রা.) কেঁপে উঠলেন লজ্জায়, ভয়ে। কেঁপে উঠলো তাঁর অন্তরাত্মা। এরপর ধীরে ধীরে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি; যখন তাঁর আত্মা ঊর্ধ্বলোকের এক আপার্থিব, অসামান্য নূরের সন্ধান পেলো, তাঁর শরীর ধুলোয় এসে নিলো আশ্রয়। তারপর সমানে মাটিতে গড়াতে লাগলেন তিনি। লজ্জায়, অনুশোচনায়, অনুতাপে আর কষ্টে তাঁর হৃদয় হাহাকার করে উঠলো। তাঁর

কান্নাভেজা কণ্ঠ থেকে অনুনয় ঝরে পড়লো। কালো বর্ণের সেই সাহাবীকেই বিনয়ের সুরে, আব্দারের সুরে তিনি এবার বললেন– 'ভাই! তুমি দাঁড়িয়ে যাও এবং দাঁড়িয়ে আমার মুখে পদাঘাত করো। একী বের হলো আমার মুখ থেকে।'

সত্যপন্থী, সত্যকণ্ঠ আবুযর (রা.) তাঁর বিনয়, বিগলন, অন্তঃক্রন্দনে বিলীন হয়ে যেতে লাগলেন। বর্ণ-বিভাজনের যে প্রাচীর দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো ধোঁয়াচ্ছন্ন মগজে, পরিচ্ছন্ন বিবেকের আঘাতে আঘাতে তাকে গুঁড়িয়ে দিলেন, মিশিয়ে দিলেন মাটির সাথে।

চলমান নমুনা

ফুলের চারপাশে ভিড় করে মৌমাছি; তেমনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারপাশ ঘিরে আছেন সাহাবীগণ। তাবৎ জাগতিকতা, পার্থিবতাকে তুচ্ছ করে বসে আছেন সকলেই, ধীর-স্থির শান্ত একটি মজলিস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র আশে-পাশে বসে থাকা সকলেই জড়োসড়ো, সুবিনীত হয়ে আছেন অনেক বেশি। বিপুল সম্ভ্রমবোধ তাঁদের হৃদয়তন্ত্রীগুলিতে তখন স্বর্গীয় অনুরণন তুলছে অনবরত। কৌতূহল তুলছে বুকের চাতালে সাইমুম। দিনমান খাটা-খাটুনি আর ব্যস্ততার অবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র মুখনিসৃত কিছু সৌরভমাখা কথা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সবক'জন সাহাবীর সত্যপ্রেমী বুক। ঈমান-একীনের স্বর্ণালী ঐশ্বর্যে হৃদয়ের কৌটোগুলোকে ভরপুর করার গভীর আগ্রহ চকচক করছে যেন তাঁদের স্বচ্ছ আদলে। কিন্তু কেউ কিছু বলছেন না তেমন। আত্মার প্রশস্ত যমীনে চঞ্চল পদক্ষেপে ঘোরাফেরা করা প্রশ্নগুলো মুখে উঠে আসার মতো ভাষা পাচ্ছে না হয়তো। অধীর সবাই, আবার নিয়ন্ত্রিত। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে থমকে থাকা পথিকের বেচাইনি।

এ সময়েই এলেন সাদাসিধে গ্রাম্য একজন মানুষ। ধীরে ধীরে এসে বসলেন। নিঃসংকোচে তাঁর উপস্থিতির ঘোষণা দিলেন। কৌতূহলী মজমা হয়তো একযোগে ফিরে তাকালো তাঁর দিকে। সরল সরল চেহারার একজন; যে

চেহারায় শান্ত সকালের পবিত্রতার ছাপ, জটিলতাহীন স্বচ্ছতার প্রলেপ। মাথার চুলগুলো অনাদরে, সামান্য উস্‌কো-খুসকো। চোখে-মুখে ক্লান্তির ক্ষণস্থায়ী ঘাম। ধূলিমলিন পোশাক শরীর ঢেকে আছে। লোকটা আছড়ে-পাছড়ে আরেকটু সামনে এগুলেন। সবাই বুঝলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কিছু বলতে চান তিনি। দ্বিধাহীন অথচ অতি বিনীত একটি সাহস তাঁর বন্ধ কণ্ঠটাকে চালু করলো। দূর থেকে ছুটে আসা মানুষটা পাত্র উপুড় করে দেওয়ার মতই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র সামনে তাঁর জমাট বাঁধা কৌতূহল ঢেলে দিলেন অনায়াসে– "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু বলুন, যা পালন করলে আমি জান্নাতে সহজে পৌঁছতে পারি।'

একদম প্রাণ থেকে উঠে আসা প্রশ্নটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুনলেন। একজন সরল মানুষের আকুতি যেন তাঁর কদমের কাছে মাথা ঠুকছে। গভীর আকুলতায় ভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে তিনি ধীর, শান্ত কণ্ঠে বললেন– 'এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। তাঁর কোন অংশীদার দাঁড় করাবে না। নামায পড়বে, রোযা রাখবে, যাকাত দেবে। তাহলেই তোমার জন্য জান্নাতে প্রবেশ সহজ হয়ে যাবে।' ততক্ষণে আগন্তুকের মুখের ঘাম শুকিয়ে গেছে। তাঁর চেহারা থেকে নিমিষেই উবে গেছে পেরেশানীর গুমোট ছাপ। উসকো-খুসকো চুল অপরিপাটি অবস্থাতেই যেন প্রচুর শোভা ধরে আছে। প্রশান্তির এক ঝলক আলোকচ্ছটা তাঁর আদলে ভেসে উঠলো পবিত্র ঔজ্জ্বল্য নিয়ে। বিনয়ে বিগলিত মুখে উচ্চারিত হলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি মেনে চলবো আপনার কথা। সামান্য বাড়াবো না, কমাবো না।'

কথাটা বলে সরল মানুষটি উঠে পড়লেন। শান্ত, ভারী পদক্ষেপে পথে নামলেন। আঁধারবিনাশী পুন্যের অলৌকিক পরশে তাঁর হৃদয়ের হালকা পাত্র এখন ওজনদার মশকে পরিণত হয়েছে। জমাটবাঁধা কৌতূহল বরফ গলার মতো গলে হয়েছে নিঃশেষ। সব পাওয়ার আমেজ বুকে নিয়ে শান্ত পদক্ষেপে তিনি হেঁটে চললেন। সাহাবীগণ তাঁর গমনপথের দিকে তাকালেন অনাবশ্যক স্বভাবী দৃষ্টি ছুঁড়ে। আড়মোড়া ভাঙার মত মনের ভিতরে তৃপ্তিময় প্রশান্তি অনুভব করলেন, নতুন কিছু শুনতে পেরেছেন বলে। পবিত্রতার সতেজ পুলকে ভরে উঠলো আবার পরিবেশ। হঠাৎ সবাই সচকিত হলেন। পুনর্বার রাসূলুল্লাহ (সা.)-র মুখের কথা শুনে অনেকটা চৈত্রমাসে পিচ্ছিল খাওয়ার মতো অবস্থা তাঁদের। একি বলছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)– 'দুনিয়াতে বসে বেহেশ্‌তী মানুষ দেখার

শখ আছে তোমাদের কারো?' দুনিয়াতে বসে, দুনিয়াতে থেকে বেহেশ্‌তী মানুষ দেখা! অসম্ভব কথা নয় কি? কিন্তু কথাটাতো যার-তার নয়? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন একথা। একথা অসম্ভব হওয়াতো আরেক অসম্ভব! তাহলে? একঝাঁক প্রশ্ন এসে তীরের মতো তাঁদের মগজের নরম মখমলে বিঁধতে থাকলো, বিঁধতেই থাকলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবীর মুখ থেকে কিছু জেনে নেয়ার মানসিকতা, সমাধান খুঁজে নেবার প্রবণতা যাঁদের আদর্শের অলংকার, সেই পুণ্যাত্মা সাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলেন– "অবশ্যই হে রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো দুনিয়াতে বেহেশ্‌তী মানুষ দেখতে চাই।'

'দেখো, দেখো– ঐ যে লোকটা চলে যাচ্ছে, তাঁকেই দেখো।' রাসূলুল্লাহ (সা.)-র মুখ থেকে এ বাক্য শূন্যে এসে আন্দোলিত, ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই আবার সচেতন হলেন, চেতনার দরজায় করাঘাত অনুভব করলেন। দরজার দিকে চোখ ছুটে গেলো সম্পূর্ণ মজলিসের। অন্যরকম অনুসন্ধানী দ্যুতি তখন তাঁদের চোখের তারায় তারায়।

তাঁরা বুঝেছিলেন, এ কথাটি শুধু ঐ লোককেই উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেননি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র কথামতো চলা প্রত্যেক মুমিনের জন্যই এ এক মহা সুসংবাদ। এ এক নতুন পথের জীবন্ত নমুনা। কৌতূহলী সাহাবীগণ তখন অদ্ভুত এক অবাক করা নৈঃশব্দে নিজেদের সঁপে দিলেন। কৌতূহল, বিস্ময় আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বহু উর্ধ্বে অর্জন ও উপলব্ধির এক স্বর্ণালী দিগন্তের দুয়ারগুলি উন্মোচিত হওয়ার প্রতিধ্বনি অনুভব করলেন তাঁরা।

ক্ষমার মিছিল

শান্তির অদৃশ্য পায়রারা তখন ডানা ঝাঁপটিয়ে চলেছে অবিরত। বোধ ও উপলব্ধির এক সীমাহীন সীমানায় বয়ে চলেছে সময়। মুক্ত ও নিরাপদ হয়েও আশ্চর্য সুন্দর এক দৃশ্যপটে দু'জন বন্দী হয়ে গেলেন। আবু লাহাবের দুই পুত্র– উৎবা আর মাতাবকে ধরে রেখেছেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দু'জনকে দু'হাতে ধরে হেঁটে চলেছেন বাইতুল্লাহ্‌র দিকে। বড্ড ভালোবাসা আর স্নেহের আবরণে মাখা সেই দৃশ্য দেখছেন উপস্থিত সাহাবীগণ।

দেখছেন আব্বাস (রা.), যিনি তিন জনেরই চাচা। দেখছেন আর বিস্মিত হচ্ছেন। দেখছেন আর আপ্লুত হচ্ছেন আনন্দে, বিস্ময়ে, ভালোবাসায়, ভালোবাসার প্রতি ভালোবাসায়। অথচ এমন হওয়ার কি কথা ছিলো? মরুর রক্তঝরানো সংস্কৃতি বিজয়ের পর এক বিজয়ীর কাছে এমন দৃশ্য কি খুব সহজেই প্রত্যাশা করে?

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার ভয় উৎবা আর মাতাবকে মক্কাছাড়া করেছিলো। অনিরাপত্তার কঠোর ও রক্তহীম করা বোধ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিলো 'আরাফার' কাছাকাছি এক নিভৃত গ্রামে। জনক আবু লাহাবের বেহিসেবী সব শান্তি-বিরোধী কর্মকান্ড, নিজেদের অপরাধ, স্খলন আর পাপাচারের কথা ভেবে তারা মক্কা বিজয়ের পর আর মক্কায় থেকে যাওয়ার সাহস করেননি। একজন মানুষ যতটুকুই শান্তিকামী হোন না কেন, তিনি যে তাদের এতসব অপরাধকে ক্ষমা করবেন না– এটা তারা ধরেই নিয়েছিলেন। জীবনের রক্তাক্ত মীমাংসার আর শাস্তিমূলক মৃত্যুর জটিল প্রশ্ন নিয়ে তারা দু'জনেই পালিয়ে গিয়েছিলেন মক্কা থেকে দূরে, আরাফায়। মানুষ ও মনুষ্যত্ব, ক্ষমা ও মানবিকতার যে পরিমাপ, প্রতিশোধের সাইমুমে বসে উৎবা আর মাতাব করেছিলেন, বেহেশতের অমলিন দিগন্তে বিপুল মর্যাদায় সমাসীন এক দিগবিজয়ী মানুষ– রাসূলুল্লাহ (সা.) সে পরিমাপকে অযৌক্তিক ও বিপরীত প্রমাণ করলেন। প্রমাণ করলেন অকল্পনীয় উদারতায়, ভালোবাসায় ও মমতায়, সত্যের জন্যই সংঘাত, সত্যের জন্যই শান্তি।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রশ্ন করেছিলেন সাহাবীগণকে– 'উৎবা আর মাতাব কোথায়?' রাসূলুল্লাহ (সা.)-র এই প্রশ্নের জবাবে সাহাবীগণ জানালেন– 'শাস্তির ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে তারা পালিয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ (সা.) আবারো বললেন– 'তাদেরকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। তাদের কোন ভয় নেই।' নিরাপত্তার এই ঘোষণা আব্বাস (রা.) শুনলেন এবং ছুটে গেলেন আরাফায়। খুঁজে পেয়ে তাদের নিয়ে এলেন মক্কায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-র দরবারে তাদের হাজির করলেন। কিছু কথোপকথনের পর তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঝড় থেকে উঠে এসে শান্তির স্নিগ্ধ সমান্তরালে তারা আগেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কালক্ষেপণ না করে

ইসলাম গ্রহণ করলেন উৎবা (রা.) আর মাতাব (রা.)। আবু লাহাবের দুই পুত্র শান্তির ফরমান পেয়েই সত্যের সুরভিত দিগন্তে প্রবেশ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের নিয়ে চললেন কাবার পথে, বাইতুল্লাহর' পথে।

বাইতুল্লাহ্‌র দরজার কাছে 'মুলতাযিমে' এসে দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। দু'হাতে দু'জনকে ধরে রেখেছেন। অপরাধের শাস্তির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া দু'জন; মৃত্যুদন্ডের আশংকায় আত্মগোপনকারী দু'ভাই কাবার দরজার সামনে দাঁড়ানো। সদ্য ইসলাম গ্রহনের পর তাঁদের হাত ধরে কাবার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। এরপর দীর্ঘক্ষণ তিনি দুআ করলেন আল্লাহ্‌র দরবারে। দুআর পর আবার ফিরে চললেন। তখন তাঁর মুখে আনন্দের দ্যুতি, নিঃশব্দ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। তিনি হাসিমুখে কাবার দরজার সামনে থেকে ফিরে আসছেন দু'ভাইকে নিয়ে।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ্!' বলে এগিয়ে এলেন আব্বাস (রা.)। আকুতি ঝরে পড়লো তাঁর কণ্ঠে। বিনয়ে বিগলিত মোমের মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো কৌতূহল। তিনি আরম্ভ করলেন– 'আল্লাহ্ তাআ'লা আপনাকে সব সময়ই হাসি-খুশী রাখুন! আনন্দিত রাখুন! কিন্তু এখন আপনার হেসে আনন্দ প্রকাশের কী কারণ?'

হাসিহাসি মুখ রাসূলুল্লাহ (সা.)-র। তিনি আব্বাসের প্রশ্ন শুনলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দু'ভাইয়ের উপস্থিতি অনুভব করলেন। সত্যের জন্য, শান্তির জন্য তাঁর ব্যাকুলতার এক পবিত্র ভুবন থেকে তিনি জবাব দিলেন– 'আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই দুই ভাইকে আমার হাতে দিয়ে দেয়ার জন্য দুআ করেছি। আল্লাহ্ আমার দুআ কবুল করেছেন। উৎবা ও মাতাবকে আমার হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

নিজের কোলে যিনি সত্য ও শান্তির ঠিকানা গড়েছেন, সেই ঠিকানায় তিনিই তুলে নিয়েছেন আরো দু'জন স্নেহাস্পদকে। ভালোবাসার ও উদারতার এক আলোকিত জোয়ারে ভেসে গেছে প্রতিশোধ ও রক্তমূল্যের অন্ধকার হিসাব-নিকাশ। নূরের ফোয়ারায় ছুটেছে ক্ষমার মিছিল।

প্রতিশোধ!

সাজ সাজ রণপ্রস্তুতি। বদরের ধূসর প্রান্তরে কয়েকশ' শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রত্যয়ী পদচারণা। যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ নয়, ক্ষমতা ও প্রাবল্যের প্রয়োজনে রক্তপাত নয়; সত্যের শান্তিময় উপস্থিতির প্রয়োজনে প্রতিরোধ। প্রতিরোধ থেকে লড়াই এবং লড়াইয়ের রক্তসাগরে আত্মনিবেদনের মুবারক মহড়া। বদর প্রান্তরে সাহাবীগণ কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং কাতারবদ্ধ সাহাবীগণকে ঘুরে ঘুরে দেখছেন। নিপুণ শৃঙ্খলার আন্দোলনে পবিত্র ও সাহসী করে তুলছেন প্রত্যেককে, প্রত্যেক আল্লাহপ্রেমী, রাসূলপ্রেমী আত্মোৎসর্গিত সাহাবীকে।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-র হাতে একটি তীর। সে তীর হাতে নিয়ে তিনি সাহাবীগণের কাতার সোজা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। আগে-পিছে সামান্য অসঙ্গতি দেখতে পেলেই ঠিক করছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরশ ও নির্দেশনায় জিহাদের জন্য তৈরী করা মন, বিজয়ের জন্যে প্রত্যয়ী হয়ে উঠছে। কাতারবদ্ধ শৃঙ্খলার একস্থানে এসে দেখতে পেলেন একজন সাহাবী-সাওয়াদ ইবনে গুযাইয়া (রা.)- কাতার ছেড়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সামান্যতম অসঙ্গতি ও শৃঙ্খলাহীনতা যাঁর চরিত-বৈশিষ্টের চার সীমানায় নেই, সেই রাসূলে আকরাম (সা.) জিহাদের পূর্বক্ষণে এই দৃশ্য দেখে হাতের তীরটি সোজা করে ধরলেন। তারপর সাওয়াদের পেটে তীরের মাথা দিয়ে খোঁচা দিলেন। আকাশের যমীনে বিচরণশীল গম্ভীর মেঘের মতো গাম্ভীর্য আর সিদ্ধান্তের অবিচলতা নিয়ে বললেন–

'সাওয়াদ! কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও।'

রাসূলে আকরামের একটি কথা যাঁদের কাছে যে কোন মুহূর্তে অসংশোধনীয় এক মজবুত সংবিধান, তাঁর একটি নির্দেশ যাঁদের কাছে জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে বাধ্য করার মতো দৃঢ় এক ফরমান, তাঁর একটি সাধারণ পরামর্শ যাঁদের কাছে অসাধারণ ও অসামান্য এক এলান, সেই মুবারক নবীপ্রেমিকদেরই

একজন হলেন সাওয়াদ; জীবনব্যাপী ত্যাগ ও আনুগত্যের সুরভিত পেয়ালা যাঁরা রাসূলে আকরামের হাতে তুলে দিয়েছেন, সাওয়াদ তাঁদেরই একজন। নবীজী তাঁকে কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলেছেন, নির্দেশ করেছেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে কাতারবদ্ধ হওয়ারই তো কথা তাঁর।

কিন্তু তিনি নির্বাক থাকলেন না। সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বিস্ময়ের দমকা হাওয়ায় পরিবেশ চমকিত করে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্‌র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন হকের পয়গাম দিয়ে। তাই আপনি আমাকে বদলা নিতে দিন।'

অবাক হওয়ারও একটা সীমানা থাকে। সীমাহীন অবাক করা বোধ আর দৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত সাহাবীগণ দৃশ্যটি দেখতে লাগলেন। একী হচ্ছে! সাওয়াদ (রা.) কি প্রতিশোধ নিতে চায় আল্লাহ্‌র হাবীবের কাছ থেকে! এ-ও কি বাস্তব!

সাওয়াদের সামনে একটি প্রবল প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়ানোর কথা ভাবছে পরিবেশ। কিন্তু অন্যদের ভাবনার আকাশে যখন কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে, আলোকিত দিবসের উজ্জ্বল প্রভায় তখন প্রায় অপার্থিব হয়ে উঠেছে আরেক আকাশ। সেই আলো চোখে নিয়ে সেই আলো মুখে মেখে নিখিল বিশ্বের তাবৎ মযলুমের যন্ত্রণা শুষে ভোরের শান্ত সমুদ্রের মত গভীর গাঢ় স্বরে নবীয়ে আকরাম তৎক্ষণাৎ বললেন– 'সাওয়াদ! তুমি বদলা নাও।'

প্রতিশোধ প্রার্থীকে প্রতিশোধ পূরণের জন্য সুযোগ ঘোষণা করলেন রাসূলে আকরাম (সা.)। তারও আগে নিজের পেটের উপর থেকে পোশাক সরিয়ে ফেললেন। বদলা গ্রহণের জন্য সমর্পণপর্ব চূড়ান্ত হয়ে হয়ে গেলো। পৃথিবীর ইতিহাস কি কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলো? যুগ যুগব্যাপী ইনসাফের কল্পনা কি এতটা বাস্তবতার সাক্ষাত পায় কখনো?

ইনসাফের এই অপার্থিব বাস্তবতা এরপর মুখোমুখি হলো সাওয়াদের। সাওয়াদ (রা.) জড়িয়ে ধরলেন নবীজীর শরীর। চুমু খেলেন মহানুভব নবীর উন্মুক্ত পেটে। স্বর্গীয় প্রাপ্তির এক খণ্ড সোনালী প্রহর উপভোগ করলেন সাওয়াদ দারুণ আনন্দে। বিস্ময়ের একসেট তশতরী যেন মেঝেতে আছড়ে ফেললেন।

বিস্ময়ের ঘোরকাটা ঘোরে সবাই দেখলেন, অকল্পনীয় এক প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ করে চলেছেন সাওয়াদ।

মমতা মাখানো মুখে নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন– 'কী করছ সাওয়াদ?'

তৃষ্ণার পর যে তৃপ্তি, আকাঙ্খার পর যে বিজয়, প্রত্যাশার পর যে প্রাপ্তি সেই– তৃপ্তি, বিজয় আর প্রাপ্তির এক অনন্য পুলক হৃদয়ে ধারণ করে হযরত সাওয়াদ আরয করলেন–

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দেখছেন, মৃত্যু আমাদের সামনে এসে গেছে। আমারও মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। শেষ প্রহরে আমি চেয়েছিলাম, আপনার মুবারক দেহের সঙ্গে আমার শরীরের স্পর্শ হয়ে যাক। এভাবে আমি আমার আকাঙ্খা পূরণ করে চলেছি।'

আশ্চর্য এক প্রতিশোধের অনুভূতি দোলানো দৃশ্য চিত্রিত হলো বদর প্রান্তরের বুকে। নবীয়ে আকরাম (সাঃ) সাওয়াদের মঙ্গলের জন্য মুনাজাত করলেন। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠার আগে বেজে উঠলো ভক্তি, ভালোবাসা ও শান্তির অপূর্ব সঙ্গীত, নীরবে-নিঃশব্দে।

মধ্যাহ্নের মরুতে বৃষ্টি!

সফরের পথে এক রোদ টাটানো দুপুর। আগুনের অদৃশ্য ফুলকি হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে সূর্যের প্রখরতা। মরুর নরম যমীনে ভাঁপ আর উত্তাপের বিস্তর দাপট। মধ্যাহ্নের আকাশ আর মরুর মাঝে যেন অলিখিত মিতালীর বন্ধন। পাল্লা দিয়ে রেগে উঠছে, তেতে উঠছে দুটোই। দূরে কোথাও লু-হাওয়ার মাতামাতি হয়তো চলছে। এদিকে, কোথাও কেউ নেই, কারো থাকার কথাও নয়। কয়েকটি বৃক্ষ আর ছায়াদার গাছ-গাছড়ার এই আঙিনায় চলতে চলতে এসে একটি কাফেলা মাত্র বিশ্রামের ঠিকানা গেড়েছে।

সফরসঙ্গী, সহচর সাহাবীদের নিয়ে এখানে এসে উঠেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম শেষ করে, যে

যার প্রস্তুতি নিয়ে এক একটি গাছের ছায়ায় গা শিথিল করে দিয়েছেন। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি আর সূর্যের উত্তাপে সবাই কিছুটা অবসন্ন। কেউ কেউ ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেউ ক্লান্তি থেকে যাত্রা শুরু করেছেন নিদ্রার দিকে। ঘুম ঘুম দুপুরের ডাকে সাড়া দিয়েছে প্রায় সবার শরীর।

সাহাবীদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিশ্রাম ও ঘুমের আয়োজন থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে একটি গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । গাছের ডালে ঝুলছে তাঁর কোষবদ্ধ তলোয়ার। মরুযাত্রার নিত্যসঙ্গী এই তলোয়ারটিও এখন বিশ্রামী। যেই মানুষ তাঁর মিশনের শুরুই করেছেন জীবনের মূল্যে, পশু শক্তির জিঘাংসা যেকোন সময় যাঁকে ছোবল দিতে পারে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে, সেই রাসূলে আকরাম এখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। নিজেকে মরুর সবুজ মখমলে, বিশ্রামের কোলে সঁপে দিয়ে পরম প্রশান্তির সাথে তিনি চোখ বুজলেন। সম্পূর্ণ নিদ্রার মাঝে তিনি ডুবে পড়লেন, নাকি তাঁর তন্দ্রালু চোখের পাপড়ি শুধু দৃষ্টিটাকে ঢেকে রেখেছে, বুঝা যায় না।

উষর মরুর মাঝে একখণ্ড সবুজে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে সাহাবীগণ এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, শুয়ে-ঘুমে অপ্রস্তুত হয়ে আছেন।

এ সময়েই এলো এক বেদুঈন। ঘুমন্ত কাফেলার মাঝে তার টার্গেট খুঁজে পেলো। একটি গাছের ছায়ায় পরম আয়েশে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দেখলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে। ইতিউতি চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হলো, তাকে কেউ দেখতে পায়নি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-র কাছে। গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। ডালে ঝুলন্ত তলোয়ারটিও দেখলো। এত সহজে এত চমৎকার সুযোগ তার জন্য অপেক্ষা করছে! ভাবতে ভাবতে জান্তব একটি পুলকের ঢেউ উঠলো তার বুকে। তারপর পৃথিবীর সুন্দরতম সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে হত্যা করার নৃশংস ইচ্ছায় সে উন্মত্ত হয়ে গেলো। গাছের ডাল থেকে তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়ে খাপমুক্ত করে ফেললো নিমিষেই। দানবীয় উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো– 'এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?'

চোখ মেলে তাকালেন আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)। শুয়ে থেকেই দেখলেন, তাঁর মাথার কাছে খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে এক হিংস্র বেদুঈন। বেদুঈনের

চিৎকার-ধ্বনি তাঁর কানে প্রবেশ করেছিলো। অল্প কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যেই তিনি আগাগোড়া পরিস্থিতি আঁচ করে নিলেন; তাঁর সংকট ও বিপন্নতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলেন। এক দুরূহ মুহূর্ত তাঁর মুখোমুখি।

বেদুঈন খোলা তলোয়ার হাতে, সশস্ত্র। তিনি নিরস্ত্র।

বেদুঈন দণ্ডায়মান। তিনি যমীনের উপর শুয়ে।

বেদুঈন তাঁকে হত্যার জন্য প্রস্তুত। তিনি অপ্রস্তুত আত্মরক্ষা করতেও এবং সর্বোপরি বেদুঈন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে– 'আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?'

তিনি সব দেখলেন, শুনলেন, বুঝলেন এবং উদ্ধত বেদুঈনের চোখের দিকে বিস্ময়কর ইত্‌মিনানের সাথে তাকিয়ে প্রশান্তির এক জান্নাতী অনুরণন তুলতে তুলতে বললেন–

'আল্লাহ্! আল্লা-হ্ আমাকে রক্ষা করবেন।'

বিপুল নিশ্চিন্তি আর নির্ভরতার এই শব্দধ্বনি মরুভূমির রীতিবদ্ধ হিংস্রতার গালে যেন সুতীব্র চপেটাঘাত, যেন অবিশ্বাসের জীর্ণ প্রাচীরের নিচে এক মুহূর্তে ঘটে যাওয়া অগণন ভূমিকম্প। কিন্তু বেদুঈনের ঘোর তাতে কাটলো না। সমান ঔদ্ধত্যে আবারো প্রশ্ন, আবারো চ্যালেঞ্জ– 'আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?'

ধীর, স্থির ও শান্ত কণ্ঠে এবারো রাসূলে আকরাম (সা.) জবাব দিলেন; জবাব নয় জবাবের অবয়বে যেন সবক দিলেন, বিশ্বাস ও ভরসার দীপ্ত ঘোষণা ভেসে উঠলো বাতাসে–

'আল্লা-হ। আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করবেন।'

অস্ত্রহাতে বেদুঈন চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের প্রকাশ ঘটালো। ঘোষণা করলো তৃতীয়বার– 'আমার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করবে কে?'

এ যেন কোন ঘোষণা নয়, ঔদ্ধত্যের কোন সামান্য প্রকাশই শুধু নয়, বরং ক্রুঢ়তা, নৃশংসতা আর সীমালংঘনের পর্বতচূড়া থেকে সমান্তরাল ভূমিতে এক অবাধ্য, দিকভ্রান্ত ঘোড়ার লাফিয়ে পড়া।

এক ও অভিন্ন জবাব এবারও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখ থেকে নিসৃত হলো। তাঁর মুবারক যবানে ফরমান ধ্বনিত হলো, ধ্বনিত হলো আবারো নির্ভরতার শ্রেষ্ঠ শব্দগাঁথা–

'আল্লাহ। আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।'

পৃথিবীর গোটা স্থলভাগ ভাসিয়ে নেওয়ার যোগ্য এক মহা, মহা সমুদ্রের বুকে জেগে উঠা বিশাল তরঙ্গের মতো এই আশ্চর্য শব্দগাঁথা মরুর তপ্ত বুকে আছড়ে পড়লো। শব্দগাঁথার সেই তরঙ্গ গ্রাস করে নিলো সকল ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা আর জান্তব হিংস্রতা।

বজ্রপাতে আক্রান্ত ব্যক্তির মত নিথর হওয়া নয়, বিদ্যুৎ সংক্রমণে কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছা যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেলো এবার বেদুঈন। তৃতীয়বারের জবাবে তার অবিশ্বাসী ঘোর শুধু কাটলোই না, বিশ্বাস, প্রশান্তি ও নির্ভরতার আশ্চর্য সুন্দর রূপ, মহিমান্বিত অভিব্যক্তি তার হৃদয়ে ভয় ও শংকার ঝড় জাগিয়ে চললো। ঝড়ে, ঝড়ে তার হৃদয় যেন থেমে থেমে যেতে চাইলো। গোটা শরীরে উঠলো কম্পন।

বেদুঈন কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে তার হাত ফস্কে পড়লো তলোয়ার। বিস্ময় ও ভীতি-বিহ্বল চোখে বেদুঈন দেখলো, সেই তলোয়ার এখন রাসূলে আকরাম (সা.)-এর হাতে। তার উচ্চারিত প্রশ্ন, তার দেয়া চ্যালেঞ্জ বৃত্তের মতো ঘুরে এবার এলো তারই কাছে। তার মনেই জাগলো এই বেদনাতুর জিজ্ঞাসা' 'এবার তাকে কে রক্ষা করবে!'

ইতোমধ্যেই আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বিক্ষিপ্তভাবে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা সকল সাহাবীকে ডাক দিলেন। একজন, দু'জন করে সকলেই এসে জমায়েত হলেন। ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে আর পরিস্থিতি দেখে, এবার উদ্ধত এই বেদুঈনের জীবনের চাকা থামিয়ে দেওয়ার কথা ছিলো সকলের। কিন্তু নির্বাক ও কম্পমান ভীত শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) কোন শাস্তির সিদ্ধান্ত দিলেন না। অবাক হয়ে সবাই দেখলেন, হত্যা করতে আসা এক উদ্ধত বেদুঈন কোন শাস্তি ছাড়াই ছুটে ছুটে চলে যাচ্ছে। পড়ি মরি করে দৌড়াচ্ছে। কারণ, কোন রক্তিম প্রতিশোধের পথ রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পছন্দ হয়নি।

তৃষিত মরুর বালিতে ঝরি ঝরি করেও ঝরলো না এক ফোটা খুন। মরুর তৃষ্ণাকাতর সিনায় ঝরলো দয়া ও মানবতার রাশি রাশি অদৃশ্য বৃষ্টির কণা, নিঃশব্দে।

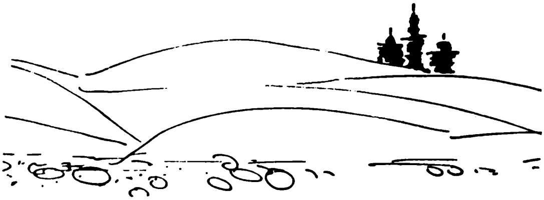

অমর মূল্যবোধ

প্রয়োজন ও চাহিদার তীব্রতা মানবীয় আকাঙ্খার গতিপথ নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণ অবস্থায় যে বিষয়টিকে মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই পাশ কেটে যায়, গুরুত্বহীন মনে করে কিংবা দূরে ঠেলে দিয়ে নির্ভার হওয়ার সুযোগ লাভ করে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেটি-ই অনেক বেশী কাঙ্খিত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

মানুষের সাধারণ এই প্রবণতাই যেন থমকে গেলো এখন। বদরের যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা যেখানে খুবই সামান্য, দৃষ্টিকটুভাবে অপ্রতুল, সেখানে দু'জন সাহাবীর যুদ্ধে যোগদানের আবেদনকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাহ্যই করলেন না। যুদ্ধে এই দুজনের অংশগ্রহণে মুসলমানদের সেনাসংখ্যা অবশ্যই কিছুটা স্ফীত হতো। যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক সাহাবী-ই তার সকল শক্তি নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, সে মুহূর্তে এ দু'জনকে যুদ্ধে যেতে বারণ করার বিষয়টি তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি।

হুযাইযা ইবনে ইয়ামান (রা.) এবং আবু হিয়াল (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-র দরবারে এসে যথার্থ কৈফিয়ত প্রদানের পাশাপাশি বুক ভর্তি আকাঙ্খা, হৃদয় ভরা প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে বললেন-'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মক্কা থেকে এসেছি। পথে কাফেররা আমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের এই শর্তে মুক্তি দেয় যে, আমরা যুদ্ধে আপনার পক্ষে যোগদান করবো না।

বদর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠার আগে পথে ঘটে যাওয়া শর্ত ও অঙ্গীকারের কথাটি তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সা.)কে অবহিত করলেন। মক্কা থেকে ফেরার পথে কাফেরদের সঙ্গে তাদের কোন্ পর্যায়ের কি কি কথা হয়েছে জানালেন, যুদ্ধের আগ মুহূর্তে তাঁদের অবস্থা-চিত্র তারা তুলে ধরলেন। তারপর তাঁরা আবারো মুখ খুললেন–

'কিন্তু এটাতো ছিলো অপারগ অবস্থার অঙ্গীকার আমরা এ অঙ্গীকার মানবো না। আমরা অবশ্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো।'

প্রত্যয়ের শেষ প্রান্তে এসে তাঁরা দু'জনই বুক টান করে দাঁড়ালেন। যুদ্ধে তাঁরা যাবেনই। ভীতি, দ্বিধা কিংবা কোন পিছুটান তাঁদের রুখতে পারবে না– এমন একটি অমলিন চেতনার সৌরভ তাঁদের কথোপকথনে ছড়িয়ে পড়ছিলো। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন আল্লাহর রাসূল (সা.) এ অবস্থায় তাঁদের হতাশ করবেন না, উল্টো যুদ্ধে যাওয়ার পথে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করে তুলবেন। পথে কাফেরদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি, যুদ্ধে না জড়ানোর শর্তের মতো মামুলি একটি বিষয় এখানে পাত্তাই পাবে না। কিন্তু তাঁদের নিশ্চিন্তির এই রেশকে তাঁদের প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের এই পাটাতনকে একদম গুড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন–

'কিছুতেই না। তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যাও। আমরা মুসলমানদের কৃত অঙ্গীকার সর্বাবস্থায় পালন করবো। আমাদের তো কেবল আল্লাহ তা'আলার সাহায্যই প্রয়োজন।'

রাসূলুল্লাহ (সা.)-র কণ্ঠে কোন রাগ ছিলো না, কোন অপ্রসন্নতার চাপ ছিলো না তাঁর মুখে। আচরণে ছিলো না ন্যূনতম অসহিষ্ণুতার চিহ্ন। বরং মুসলমানের অঙ্গীকার ও ওয়াদার আকাশ সমান মুল্যের ঘাটতি হতে না দেওয়ার একটি অপার্থিব দৃঢ়তার ধ্বনি ফুটে উঠেছিলো তাঁর মুখনিসৃত বাণী থেকে। মানবীয় প্রয়োজন কিংবা তীব্র প্রয়োজন শুধু নয়। আল্লাহর দ্বীনের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামেও অঙ্গীকার ভঙ্গের কোন পথ ধরে যেন কেউ বিপথে হেঁটে না যায়, সেই ফরমান ঝরে পড়ছিলো তাঁর আচরণ থেকে। বিরক্তিহীন, দায়হীন স্বচ্ছতার এক হিরকমূল্যের উপলব্ধি উপহার দিলেন তিনি দু'জনকে।

থমকে গেলেন দুই সাহাবী। মামুলি মুল্যবোধের ঘুণেধরা ফ্রেম ভেঙে-চুরে তাঁদের হৃদয়ে উদয় হলো প্রাচুর্যময়, সমৃদ্ধ ও জীবনবাদী এক অমর মূল্যবোধের। অবাক হয়ে সাহাবীগণ দেখলেন– ঈমানদীপ্ত নীতির পাহাড়ে মানবীয় কোন প্রয়োজনের ভঙ্গুর ডিঙ্গি এসে ডক্কর দিতে পারে না।

ইতমিনান

মারের আঘাতে গোলামটি চিৎকার করছিলো।

কোন একটি অপরাধের কারণে নিজের এক কৃতদাসকে মারছিলেন আবু মাসউদ আনসারী (রা.)। এমনিতে তিনি সহনশীল, মমতাবান ও হৃদয়ের মূল্যায়নকারী একজন মানুষ। অত্যাচার, নিপীড়ন কিংবা শোষণ তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত নয়। তথাপি নিজের কৃতদাসের প্রতি তাঁর রাগ ও ক্রোধটাকে তিনি সংবরণ করতে পারেননি। অনেক সময়েই যেমন হয়, মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয় না। ধৈর্যের বাঁধভাঙ্গা স্রোতে তখন অসহিষ্ণুতার শ্যাওলা এসে ভীড়ে যায়। তখন বিচার-বিবেচনা ও সৌজন্যের সুউচ্চ মিনার থেকে কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ মাটির সমান্তরালে চলে আসে। এমন জটিল পরিস্থিতিতে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজনেরও ব্যবধান লোপ পেয়ে যায় অনেকাংশে; কৃতদাসের ব্যাপারতো আরো দূরে।

এমনই কিংবা এরই কাছাকাছি এক অবস্থায় আবু মাসউদ আনসারী (রা.)। প্রহার করছেন তিনি তাঁর কৃতদাসকে, এ সময়েই সেখানে তাশরীফ আনলেন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মমতা ও দয়ার একটি সফেদ আকাশ যাঁর বুকের মধ্যে আশ্রয় গেড়ে বসে আছে, সেই শ্রেষ্ঠতম মানব এক কৃতদাসের প্রতি একজন মনিবের ক্রোধ লক্ষ্য করলেন। মার খাওয়া কৃতদাসের বেদনা ও যন্ত্রণা লক্ষ্য করলেন। একজন মানুষের কাছে অন্য একজন মানুষের করুন অসহায়ত্ব লক্ষ্য করলেন। ব্যথায় ব্যথায় তাঁর হৃদয় আকাশে কালো মেঘ জমে উঠলো। দুনিয়ার, সকল মযলুমের অসহায়ত্ব শুষে, সমবেদী স্বরে তিনি শুধু বললেন–

'আবু মাসউদ! এই কৃতদাসের উপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশী।'

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন না– তুমি মার বন্ধ করো। তোমার একাজ খুব খারাপ।' তিনি শুধু একজন মুমিনকে, একজন সাহাবীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন

আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার কথা, জাগিয়ে দিলেন একজন মুমিনের হৃদয়ে পরকালে জবাব দিহীতার ভীতি, সৃষ্টি করলেন যুলুমের পরিণতির ভয়াবহ আশংকা। এর চেয়ে বেশীতো কিছু নয়! সাথে সাথেই ভয়ে কেঁপে উঠলেন আবু মাসউদ (রা.)। মাটির সমান্তরাল থেকে এক দৌড়ে উঠে এলেন আত্ম নিয়ন্ত্রণের সুউচ্চ মিনারে। ধৈর্যহীনতার শ্যাওলার সব জঞ্জাল সরিয়ে, আত্মার বিশুদ্ধ এক পুকুরে যেন অবগাহন করে উঠলেন। অনুশোচনা, অনুতাপ আর ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলেন। অনতিবিলম্বে আরয় করলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই কৃতদাসকে এখন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্বাধীন করে দিলাম।'

দম বন্ধ অবস্থার ভয়াবহতা থেকে যেন দম ফিরে পাওয়ার অনুভূতি, ডুবে যেতে যেতে বেঁচে যাওয়ার আকুতি আর হারিয়ে যেতে যেতে পথ চিনে নিঃশ্বাস ছাড়ার আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে আবু মাসউদ (রা.)-এর মুখে। তাঁর কথা শুনলেন, তাঁর দিকে লক্ষ্য করলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যাওয়া মানবতার ভুবন যিনি আবার গড়ে তুলেছেন, শোষক আর জান্তব মানবাচরণে যিনি ইছলাহের শৃঙ্খল বসিয়েছেন, মযলুম ও যালিমকে বাঁচানোর ব্যতিক্রমী, বিস্ময়কর ফরমান যিনি শুনিয়েছেন, সেই হাবীবে খোদা (সা.) এবার বললেন ভরাট কণ্ঠে–

'এমন না করলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে স্পর্শ করতো।'

শান্তি ও শাস্তির কথা তাঁর পবিত্র মুখে পাশাপাশি আন্দোলিত হয়, প্রত্যাশা ও ভীতির কথা তাঁর মুবারক যবানে পাশাপাশি উঠে আসে। তিনি মুক্তির অনন্য সওগাত নির্লিপ্ত ভাবেই বিতরণ করে যান। আবু মাসউদ (রা.) হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যুলুমের দায় থেকে, জাহান্নামের আগুনের ছোবল থেকে বেঁচে যাওয়ায়, তাঁর চেহারায় অনুতাপ ও বিগলনের পাশাপাশি ইতমিনানের শুভ্র আবীর ছেয়ে গেলো।

মারখাওয়া কৃতদাস অবাক হয়ে দেখলো, সে এখন স্বাধীন।

নবীজীবনের দ্যুতিময় কাহিনীগুচ্ছ

সবুজ গম্বুজের ছায়া

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ

প্রকাশক
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২৮৯৫৭৮৫

চতুর্থ মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৮ ঈসায়ী
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগষ্ট ২০০৫ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ২০০১ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ জুন ১৯৯৯ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ বশির মেসবাহ্
গ্রাফিক্স ঃ রিয়াজ হায়দার
ডট প্লাস, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-70250-0006-3

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

SOBUJ GOMBUJER SAYA
Maulana Sharif Muhammad
Price Tk. 50.00 US $ 2.00 onl

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি গ্রন্থ

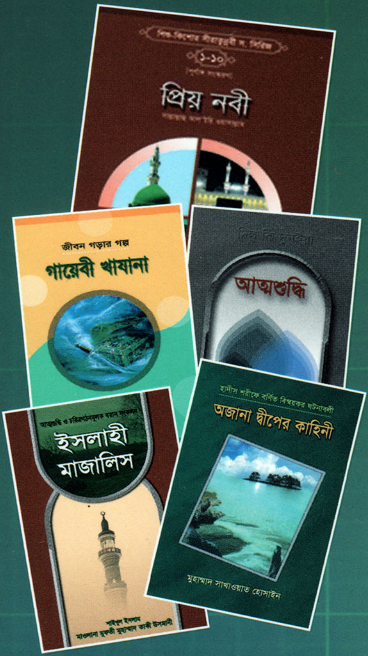

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net